যত দূর পৃথিবী তত দূর পথ

রবি গুহ মজুমদার

স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী স্বর্গবাসিনী জননীকে

যত দূর পৃথিবী তত দূর পথ

প্রথম সংস্করণ :
কার্তিক ১৩৬৫

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীমতী রূপা মজুমদার
ডাক পাবলিশার্স
১।১।১ হাজরা রোড
কলিকাতা ২৬

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন ঃ
শ্রীঅরুণকুমার পাইন

বই ছাপিয়েছেন ঃ
শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা ১৩

ব্লক তৈরি করেছেন ও প্রচ্ছদপট ছাপিয়েছেন ঃ
রেডিয়েণ্ট প্রসেস
৬ এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা ১৩

বাঁধিয়েছেন ঃ
নন্দী ব্রাদার্স
১০ করিস চার্চ লেন
কলিকাতা ৯

দাম ঃ তিন টাকা

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস ঃ

যদি

বনহরিণীর কাব্য (যন্ত্রস্থ)

আরম্ভ

পুরুষের ভাগ্য, মানুষ তো মানুষ, দেবতারাও জানেন না এই হল কিংবদন্তি। দৈবজ্ঞ চটে গেলেও আপনার আমার সান্ত্বনা এই যে বিধাতাপুরুষ আর যাই করুন কার ললাটে কী লিখলেন তা চাউর করে বেড়ান না। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে বিধাতাপুরুষের কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ক কি খুব বিশ্বাসী যে জন্যে দেবতারাও তাঁর মনোভাবের হদিস পান না, না ভদ্রলোক নিজেই খামখেয়ালী যে জন্যে আপনার আমার এই দুর্দশা ?

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে বিধাতাপুরুষেরও খুব দোষ নেই। কারণ, যাকে আমরা জীবন বলি তা হল অনেকগুলো জীবনের সমষ্টি—ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জীবিকামূলক। ফটকা বাজারের শেয়ারের মত এক একটা জীবনের দাম বাড়ে-কমে। কাজেই একটা নির্দিষ্ট সময়ে সবগুলো জীবন একসঙ্গে দাঁড়িপাল্লায় চাপালে যা ফল হয়, তাই হয়ে দাঁড়ায় আমাদের আপাতদৃষ্ট জীবন, বা আমাদের ভাগ্য।

বিষ্ণুর জীবনে ভাগ্য বিপর্যয় গল্পলেখার মত

দুই

বিষ্ণুর বাবা হরনারায়ণবাবু ছিলেন সামান্য চাকুরে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসামান্য। রাজদ্বারে প্রহরীর বুটের মত তাঁর খড়ম কর্ণসচেতন করে দিত বাড়ির সবাইকে। নিখুঁত নিয়মানুবর্তিতায় চলত তাঁর সংসার। অভাব অনটনকেও তাল রেখে চলতে হত তারই সঙ্গে।

রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজায় তালা দিয়ে দিতেন হরনারায়ণবাবু। জলের কলগুলো পরীক্ষা করে, সিঁড়ির আলো নিভিয়ে, ঘরে ঘরে সকলকার খোঁজ নিয়ে, তবে তিনি শুতে যেতেন।

বাড়িতে সাবালক ছেলে বলতে বিষ্ণু। সন্ধ্যার পর বাইরে থাকার অনুমতি তারও ছিল না। কালেভদ্রে দেরি হয়ে গেলেও ঘণ্টার কাঁটা দশ ঘর পেরবার আগেই তাকে বাড়ি ফিরতে হত। এমন কোনও দিন হয়নি যে হরনারায়ণবাবু সদর দরজা বন্ধ করে ওপরে গিয়ে দেখলেন বিষ্ণু ঘরে নেই।

আজ সত্যিই বিষ্ণু ঘরে নেই। তা জেনেও বিষ্ণুর মা চুপ করে আছেন কেন হরনারায়ণবাবু বুঝতে পারলেন না।

কলেজে থিয়েটার? থিয়েটার তো এর আগেও হয়েছে! দেরি তো কোনও দিন হয়নি!

—'আজ বিষ্ণু থিয়েটার করছে! কলেজ থেকে জোর করে ওকে নাবিয়েছে।'

হরনারায়ণবাবু জড়ীভূত হয়ে গেলেন। বিষ্ণু থিয়েটার করছে? তাঁকে না জানিয়ে? যে বিষ্ণুকে শুধু তিনিই আদর্শ পুত্র বলে স্বীকার করেন নি, যে বিষ্ণুকে কলেজের প্রতি প্রফেসার আদর্শ ছাত্র বলে

স্বীকার করে বলে তিনি শুনেছিলেন, তার আদর্শ চরিত্রের এই দৃষ্টান্ত ? হরনারায়ণবাবু জানতে দিলেন না তাঁর রাগের চণ্ডালত্ব। সদর দরজার চাবি তুলে দিলেন স্ত্রীর হাতে।

বিষ্ণুর আজ উপায় ছিলনা। জীবনে এই তার প্রথম অভিনয়। আর যেমন তেমন অভিনয় নয়। একেবারে নায়কের ভূমিকায় সে আজ নেমেছিল। সকলের দৃষ্টি ছেয়েছিল তার ওপর।

কিন্তু সকলের মান সে রাখতে পেরেছে। কলেজের মান, যাঁরা জোর করে তাকে নামিয়েছিলেন তাঁদের মান—বিশেষ করে শান্তার মান। অভিনয় নৈপুণ্যে কোন মান্যবর অতিথিকে খুশি করে সে একটা মেডেলও পেয়েছে—ফিনফিনে সাদা কাগজে মোড়া ঝকঝকে রূপোর মেডেল। দাতা বলেছেন পরে নামও খোদাই করে দেবেন তার ওপর। বলতে গেলে বিষ্ণুর প্রথম তীর বৃষচক্ষু বিদ্ধ করেছে।

থিয়েটার শেষ হয়ে গিয়েছিল এগারটার আগে। তবু বাড়ি ফিরতে বিষ্ণুর অনেক রাত হয়ে গেল। পাটাতনের ওপর ময়লা শতরঞ্চিটার মায়া ছেড়ে সে যেন আসতে পারছিল না। তাছাড়া কতজনকে দেখাতে হল মেডেলটা। পিঠ চাপড়ানর শেষ নেই। শান্তাও বাহবা জানাল। বিষ্ণু বললে সব কিছুর জন্যে দায়ী সে। যাবার পথে শান্তা তাদের মোটরে নামিয়ে দিয়ে গেল। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারটা।

বিষ্ণুর মা অপেক্ষা করছিলেন। ভাত ঢাকা ছিল। পাশে রেকাব ঢাকা জলের গেলাস। পাতা আসন। বিষ্ণু ফিরতে তার হাতে চাবি দিয়ে মা শুতে গেলেন। বলে গেলেন ঘুম থেকে উঠেই যেন বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসে।

বিষ্ণু মেডেলটা মাকে দেখাতে গিয়েও দেখাল না। পকেটে হাত

রেখে ভাবল সকলের সামনে বার করবে সকালবেলা। তাতে বাহাদুরির বহরটা নিশ্চয় বাড়বে।

হাত মুখ ধুয়ে খেতে খেতে আরও রাত বেড়ে গেল। বিষ্ণু ক্লান্ত দেহে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল।—এ কী ?

বিষ্ণুর পড়ার টেবিলের ওপর সযত্নে মলাট দেওয়া পোষ্ট অফিসের পাশ বই—যাতে তার অন্নপ্রাশন, উপনয়ন আর বৃত্তির সব টাকা বাবা গচ্ছিত রেখেছিলেন। আর কয়েকটা ছোট ছোট সোনার আংটি, বোতাম।

এর অর্থ ? বিষ্ণুর মাথাটা ঘুরে গেল। হাতের মুঠোয় চেপে ধরল পিতৃদত্ত সম্পত্তিগুলো। ঘরের আলো নিভিয়ে, এক হাতে দু পাটি জুতো ধরে, পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেল। সদর দরজার তালা খুলে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

নির্জন রাস্তা। সারি সারি আলোর স্তম্ভ। যেন আলো আর অন্ধকার পর পর সাজান।

তিন

বিষ্ণু রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। সে শুধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে নেই, পথে দাঁড়িয়েছে।

এই তো সেদিনের কথা। বৃত্তি পেয়ে বিষ্ণু স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকল—এমন কলেজে যেখানে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে। হরনারায়ণবাবুর রাজী হবার কথা নয়। কিন্তু বন্ধু ভরতশাস্ত্রী মহাশয় ভরসা দিলেন যে তাঁর ভয়ে

কলেজের বাড়িটা পর্যন্ত কাঁপে দুগ্ধপোষ্য ছেলেমেয়ে তো দূরের কথা। তাছাড়া বিনাবেতনে ভাল কলেজে পড়তে পাবে বিষ্ণু শুধু তাঁরই খাতিরে। এও কম সুযোগ নয়। হরনারায়ণবাবু শেষ অবধি মত দিলেন।

বিষ্ণু বুঝল তার দায়িত্ব। বাবার শঙ্কা, পিতৃবন্ধুর মর্যাদা এবং সেই সঙ্গে নিজের ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করে সে সহপাঠিনীদের শত হস্ত দূরে রেখে চলতে লাগল।

কিন্তু একদিন কলেজের থিয়েটার দেখতে গিয়ে বিষ্ণু আবিষ্কার করল যে তার মনেও চঞ্চলতা আছে, দুর্বলতা আছে। দোতলার গ্যালারিতে অসংখ্য ছাত্রের ভিড়ে কোণঠাসা হয়ে বিষ্ণুর অদম্য বাসনা হতে লাগল একবার ষ্টেজের ভেতর গিয়ে 'বন্দনা'কে অভিনন্দন জানিয়ে আসে। মেয়েটির নাম শান্তা সে জানে। তার কলেজে ঢোকবার এক বছর পরে এক ক্লাশ নীচে ভরতি হয়েছিল শান্তা ব্যানার্জি, নামকরা ইঞ্জিনিয়ার গুরুপদ ব্যানার্জির মেয়ে।

বিষ্ণু শেষ অবধি বসে বসে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠল। তার বাসনা ত্রিশঙ্কুই রয়ে গেল। এক দৃশ্যের মাঝখানে বেরসিকের মত উঠে পড়ে সে বাড়িমুখো বাস ধরল।

বাসনা হল মজার আগুন। দপ করে জ্বলতেও যতক্ষণ, ইন্ধন না পেলে নিভতেও ততক্ষণ। অনেক বাসনা কিন্তু জ্বলেও না নেভেও না, ছাই চাপা আগুনের মত মড়া সেজে বেঁচে থাকে। লোকে বলে এই রকম বাসনার এক শক্তি থাকে, যার নাম ইচ্ছাশক্তি, যা দিয়ে সে আর কিছু না পারুক বার্তা বহন করতে পারে।

বিষ্ণুর বাসনা নিশ্চয় বার্তা বহন করেছিল। নাহলে এত ছাত্র থাকতে হঠাৎ তাকে একদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শান্তা বলবে কেন, বন্যাপীড়িতদের জন্যে আমরা যে ফাণ্ড্ খুলেছি তাতে আপনি কিছু সাহায্য করেছেন?'

বিষ্ণু চমকে উঠেছিল। শান্তার মার্জিত বেশভূষার দিকে চেয়ে বলেছিল, 'আমি নিজেই সাহায্যপ্রার্থী, সাহায্য করার ক্ষমতা আমার নেই।'

শান্তা কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলেছিল, 'অর্থ সাহায্যই একমাত্র সাহায্য নয়। এই নিন একটা চাঁদার খাতা। যা পারেন আদায় করে আসছে শনিবারের মধ্যে ফেরত দেবেন।'

শান্তা দাঁড়ায়নি।

আশ্চর্য লেগেছিল বিষ্ণুর শান্তাকে। এতদিন সহপাঠিনী কেন তরুণী মাত্রকেই সে ভয় করে এসেছে। যেন নারীকে নারী বলেই ভয়। কিন্তু শান্তার সঙ্গে সামান্য আলাপেই তার ভয় অনেকখানি কেটে গেল। বিষ্ণু বুঝল এটা ভয় নয়, দুর্বলতা। বলিষ্ঠতরর কাছে ভয় শুধু দুর্বলের। শুধু মানুষ নয়, পশু, মোহ, নেশা সবই ভয়ের পাত্র যদি তা বলিষ্ঠতর হয়।

শান্তার সঙ্গে পরিচয় ক্রমশঃ মেলামেশায় পরিণত হলেও বিষ্ণুর ছাত্রজীবনে কোন বাধার স্থষ্টি হল না। বরঞ্চ তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। যথাসময়ে সে কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পাশ করল।

এরপর শান্তাদের বাড়িতে বিষ্ণু মাঝে মাঝে যেতে লাগল। শান্তার মা জীবিত ছিলেন না। স্নেহময় পিতা, কয়েকটি ভাইবোন ও দিদিমাকে নিয়ে তাদের শান্তির সংসার। বিষ্ণু সহজভাবে খাপ খাইয়ে নিল সকলকার সঙ্গে।

বি-এ পাশ করার পর কলেজ ছেড়ে বিষ্ণু এম-এ পড়তে লাগল ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু কলেজের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘুচে গেলনা। প্রায়ই একাজে ওকাজে ডাক পড়তে লাগল কলেজ থেকে।

সাধারণতঃ কলেজের কোন দাবি সে অপূর্ণ রাখত না। সাধ্যমত সাহায্য করত তার সময় ও শ্রম দিয়ে। ভরসা পেয়ে কলেজের সোশ্যাল কমিটি ঠিক করলেন বিষ্ণুকে নায়ক করবেন পরের নাটকে। শান্তা দায়িত্ব নিল তাকে রাজী করাবার। তলব পেয়ে বিষ্ণু হাজির হল কমিটি

মিটিংএ। বললে, 'এ রসিকতা ছাড়া কিছু নয়। এত ভাল ভাল অভিনেতা থাকতে আমি? জীবনে যে কখনও ষ্টেজে দাঁড়ায়নি?'

শান্তা বললে, 'গদাই'-এর ভূমিকায় নামতে হলে অভিনয় সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞতা না থাকাই ভাল।'

—'কিন্তু আমি যে কস্মিন কালে—।'

প্রফেসার বটব্যাল বাধা দিয়ে বললেন, 'তা হোক। আমরা অনেক ভেবেচিন্তে তোমায় সিলেক্ট্ করেছি। তোমার এখন আপত্তি করা মানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে অপমান করা।'

শান্তা বললে বিষ্ণু রাজী না হলে তার বড় মুখ ছোট হয়ে যাবে।

বিষ্ণু ফাঁপরে পড়ল। বলতে পারল না যে অভিনয় করার জন্যে বাবার অনুমতি কিছুতেই পাবে না সে। অস্বীকারও করতে পারল না যে অভিনয় করতে কেমন লাগে তা জানবার জন্যে সে নিজেই আকুলিবিকুলি করেছে এর আগে। যখন তার স্বপ্ন ফলে গেল, আদ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে পাওয়ার মত তার কপালে জুটে গেল নায়কের ভূমিকা—অমন নাটকে কবিগুরু যার রচয়িতা আর শান্তা হবে যার নায়িকা—কী করে সে বলে 'চাই না'? বিষ্ণু তা বলতে পারল না।

বিষ্ণু রাজী হল। কমিটি বাহবা দিলেন শান্তাকে।

কিন্তু এখন শান্তাকে গিয়ে বলা বৃথা যে তোমার জন্যে আমি পথে দাঁড়ালাম।

চার

রাত দুটোর সময় বিষ্ণু কলকাতার নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল।

মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশ। পালিশ করা হীরের টুকরো গুলো জ্বলজ্বল করছে। রূপোর হাঁসুলি না পরেই তাকে আজ ভাল দেখাচ্ছে। বাতাসে হিমের গন্ধ। স্বর্গের দেবদেবী যেন মর্তভ্রমণে বেরিয়েছেন। বোঝা যায় তাঁরা এসেছেন, অথচ দেখা যায় না কাউকে।

অসময়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অশোভন। বিষ্ণু ভাবল একটা কিছু করা উচিত। যদি হাঁটতেই হয় লক্ষ থাকা দরকার। এত রাত্রে কোথায় যাবে সে? কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি? কেন? আশ্রয়ের জন্যে? কতটুকু আশ্রয়?

হঠাৎ বিষ্ণুর মনে পড়ে যায় দুলালের কথা। স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে স্পষ্ট মনে আছে ঐ ছেলেটিকে। বিষ্ণু আর দুলাল ছিল ঢেঁকির এদিক আর ওদিক। বিষ্ণু যত ভাল, দুলাল তত খারাপ। অথচ তাদের বন্ধুত্ব দেখে অবাক হয়ে যেত সবাই।

দুলালের মামা ছিলেন বড়লোক। নাকি খুব বড়লোক—অনেকগুলো বাড়ি, বাগান, গাড়ি আর ঘোড়া। তাছাড়া একটা নামকরা থিয়েটারের মালিক ছিলেন তিনি। দুলাল কতদিন বিষ্ণুকে সেধেছে থিয়েটার দেখবার জন্যে। বিষ্ণুর কান লাল হয়ে উঠেছে। বায়োস্কোপই সে দেখেনি—থিয়েটার তো দূরের কথা। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছে—'তুই কখনও গেছিস থিয়েটার দেখতে?'

পোকাখাওয়া দাঁত বার করে দুলাল হেসে উঠেছে—'কী যে বলিস তুই? আমার মামার থিয়েটার—আজ বাদে কাল আমি

মালিক হব—আর আমায় তুই জিজ্ঞেস করছিস থিয়েটার দেখেছি কিনা ?'

একবার অনেক কান্নাকাটি করে বিষ্ণু আর তার ভাইবোনেরা সার্কাস দেখবার অনুমতি পেয়েছিল। মা আর এক কাকা সঙ্গে গিয়েছিলেন। কালীপূজোর বাজি পোড়ার মত হু হু করে পুড়ে গেল ঘণ্টা তিনেক সময়। পরে কাকার মুখে শুনেছিল যে সারাটাক্ষণ বিষ্ণু নাকি হাঁ করে বসেছিল। তার মনে আছে, এক এক জনের টিকিট লেগেছিল আট আনা করে।

—'তোর মামার থিয়েটারে কত করে টিকিট ?' একবার জিজ্ঞেস্ করে ফেলেছিল বিষ্ণু।

দুলাল পিঠ চাপড়ে বলেছিল, 'তোদের বাড়িশুদ্ধু সবাইকে এক শ টাকার বক্সে বসিয়ে দেব—পয়সা লাগবে না।'

—'এক শ টাকা ?' বিষ্ণুর চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠেছিল—'বন্ধুর জন্যে তুই মামার এক শ টাকা লোকসান করাবি ?'

—'তোর যেমন কথা ! মামা কী বলে জানিস ? মামা বলে, লাখ টাকা গেলে লাখ টাকা পাওয়া যায় কিন্তু বন্ধু গেলে আর বন্ধু পাওয়া যায় না।'

এ হেন বন্ধু দুলালের কথা মনে পড়তে বিষ্ণুর মনে ক্ষীণ আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। কিন্তু এত বছর পরে দুলালকে খুঁজে বার করা যে সহজ হবেনা বিষ্ণুর তাতে সন্দেহ ছিলনা। তবু একটা গন্তব্য স্থান পেয়ে বিষ্ণু জোরে জোরে পা চালাল। নিশুতি রাত হলেও থিয়েটারপাড়ায় কাউকে না কাউকে সে পাবে যে দুলালের খোঁজ দিতে পারবে।

বড় রাস্তা ধরে বিষ্ণু এগিয়ে চলল দক্ষিণ থেকে উত্তরে। আশ্চর্য এই মহানগরী—আশ্চর্য এর রাজপথ ! আলো আর অন্ধকার পর পর

সাজান। এখনও কোন কোন বাড়ির জানলায় আলো—হয়ত রাত শেষ হয়নি কারুর, অথবা দিন আরম্ভ করল কেউ। কোন কোন দোকানের সামনে ঝাঁট দেওয়া এখনও শেষ হয়নি—কেউ বা তৈরী হচ্ছে আগামী দিনের জন্যে। মাঝে মাঝে দু একটা ট্যাক্সি বা মোটর ফুলস্পীডে উধাও হয়ে যাচ্ছে, আবার রিকশাওলার ঠুনকো ঘণ্টা বেজে উঠছে থেকে থেকে—ভিড় নেই যে সরাবে—বদভ্যাস। কেউ ফিরছে যাত্রা শেষ করে, কারুর যাত্রা হল শুরু।

বিষ্ণুকে হাঁটতে হল অনেকটা পথ। দুটো থিয়েটারের দরজা থেকে ফিরে আসতে হল কোন সাড়া না পেয়ে। অতরাত্রে লোকজানাজানি করতে সাহস হল না তার। তবে আর একটা থিয়েটারে যেতে দেখা হল দরোয়ানজীর সঙ্গে। থিয়েটারের দোর গোড়ায় খাটিয়া পাতা ছিল। শেষ রাতে হাঁপানির তাড়নায় দরোয়ানজী উঠে বসেছিলেন। আর অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে শরীর কুঁকড়ে উঠছিল কাশির ধমকে। দরোয়ানজী একটু সামলে উঠতে বিষ্ণু সহানুভূতি জানাল। তাতেই পাঁড়েজীর মন ভিজে গেল। বিষ্ণুকে খাটিয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হলেন তিনি। বাকী রাতটুকু তাঁর আর ঘুম হবে না। বিষ্ণু ধন্যবাদ জানিয়ে আদ্ধেক খাটিয়া দখল করল মাত্র। পাঁড়েজী জেগে থাকলে সেও আর কয়েক ঘণ্টা অনায়াসে জেগে কাটিয়ে দেবে।

দুলালের হদিস পাবার জন্যে বিষ্ণুকে কোন চেষ্টাই করতে হল না। দুলাল যে তার মামার দৌলতে এবং নিজের কীর্তিতে এ পাড়ায় এত প্রখ্যাত বিষ্ণুর তা জানা ছিল না। নাম শুনেই পাঁড়েজী ভ্রূকুটি করে বলে উঠেছিলেন—'দুলালবাবু? এত রাত্রে দুলালবাবুকে খুঁজতে বেরিয়েছেন?' পরে শান্ত হলেন বিষ্ণু যখন বলল যে দুলাল তার বাল্যবন্ধু। কয়েক বছর তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। আজ একটা জরুরী কাজে সে দুলালের খোঁজে এসেছে। এই সঙ্গে বিষ্ণু একটা মিথ্যে কাহিনীও জুড়ে দিল। বললে, গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে সে তার বাক্সবিছানা হারিয়ে ফেলেছে—এক রকম পথে পথেই কাটিয়েছে

সারাটা দিন—তারপর দুলালের কথা মনে পড়ায় সে বেরিয়েছে তার খোঁজে। পাঁড়েজী এবার ঘাড় নাড়লেন। হ্যাঁ, দুলালবাবুর দিল্ দরাজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে বিষ্ণুর আর কোন ভাবনা থাকবেনা এ তিনি হলফ করে বলতে পারেন। অবশ্য দুলালবাবুর মামা কার্তিকবাবু যে-থিয়েটারের মালিক পাঁড়েজী সে-থিয়েটারের নোকর নন, তবুও তিনি কথা দিলেন যে সকালেই দুলালবাবুর বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করে এনে দেবেন।

ভোর রাতে রাস্তায় জল দেওয়া শুরু হতেই পাঁড়েজী উঠে পড়লেন এবং থিয়েটারের দরজা খুলে বিষ্ণুকে বাথরুম দেখিয়ে দিলেন। বিষ্ণু ফিরে এসে সামনের চায়ের দোকানে আশ্রয় নিল। পাঁড়েজী বেরিয়ে পড়লেন দুলালবাবুর ঠিকানা আনতে।

দোকান সবে খুলেছে। বালতির উনুনে বিরাট এক চায়ের কেটলি বসান। তার সামনে একটি ছোট ছেলে ভাঙ্গা পাখার হাওয়া খাইয়ে অগ্নিদেবকে জাগাচ্ছে। দোকানে যাঁরা ঢুকছেন বেশীর ভাগই পাঁউরুটির খরিদ্দার। দোকানদার লোক বুঝে তাজা রুটির সঙ্গে বাসি রুটি চালিয়ে দিচ্ছেন।

শুধু এক পেয়ালা চা খেয়ে যথেষ্ট সময় কাটান গেল না। বিষ্ণু আর এক প্রস্থ চা আর টোস্টের অর্ডার দিল।

পাঁড়েজী ফিরে আসতে বিষ্ণু দুলালের ঠিকানাটা পকেটে পুরে তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছিল। পাঁড়েজী হেসে বললেন ব্যস্ত হবার কিছু নেই—দুপুরের আগে দুলালবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। বিষ্ণু দোনামনা করে দুলালের বাড়ির দিকেই রওনা হল।

বাড়ি দেখে বিষ্ণুকে স্বীকার করতে হল যে স্কুলে পড়বার সময় দুলাল যা বলত তা নেহাত মিথ্যে নয়। তার মামা যে বহু অর্থের মালিক তাতে কোন ভুল নেই। বিরাট বাড়ি—ফটকের দুই ধারে দুই স্তম্ভ—একটির ওপর ধাতব ফলকে লেখা 'শ্রীকার্তিকচন্দ্র সেন' অপরটির ওপর বাড়ির নম্বর। ভেতরে ঢুকলে দেখা যায় সামনে গোলাকার বাগান—মাঝখানে

ফোয়ারাহাতে নগ্ন পরী—বাগানের এক পাশে একাধিক মোটর ও জুড়িগাড়ি রাখার গ্যারাজ ও আস্তাবল—অন্য পাশে ভৃত্যাবাস। এগিয়ে গেলে গৃহস্বামীর আর্থিক প্রাচুর্যের আরও অনেক নিদর্শন চোখে পড়ে।

এই নিদর্শনগুলো ঠিক বেকার নয়। আগন্তুককে পদে পদে স্মরণ করিয়ে দেয় তার সঙ্গে গৃহস্বামীর প্রভেদ কোথায়—অবস্থা, শখ রুচির পার্থক্যে কার কোথায় স্থান।

বিষ্ণু ভেবেচিন্তেই ফটকের ভেতর পা বাড়িয়েছিল। তাই দরোয়ানজীর স্ফীতোদরে নিম্ন নাভি দেখে ভড়কাল না। 'আভি দেখা নেহি হোগা' শুনেও সে অপেক্ষা করবার আসন দাবি করল। কয়েক ঘণ্টা রাস্তায় টো টো করে বেড়ানর চেয়ে ঘরে বসে কড়িকাঠ গোনা ভাল। দরোয়ানজী বিরক্ত হয়ে বিষ্ণুকে নিয়ে গেলেন সরকারমশাইয়ের কাছে। সরকারমশাই অনুমতি দিলেন বৈঠকখানায় বসবার। তবে জানিয়ে দিলেন যে বারটার আগে দুলালবাবু নীচে নামবেন না।

সিঁড়ি থেকে শ্বেত পাথর শুরু হল। দারোয়ানজী খড়মের শব্দ করতে করতে বিষ্ণুকে পৌঁছে দিলেন এক সুসজ্জিত হল ঘরে যার নাম বৈঠকখানা।

এখানে কড়িকাঠ গোনার দরকার হয়না। দেয়ালে এ-মোড় ও-মোড় ছবি। চক্ষু লজ্জায় না বাধলে আর্ট গ্যালারীর মত প্রদক্ষিণ করা চলে। অনেক সময় তাতে কেটে যায়। আরও সময় হাতে থাকলে টেবিলে টেবিলে সাজান নিখুঁত ভাস্কর্যের নমুনাগুলো পরিদর্শন করা। তারপর ইচ্ছে হলে কেন্দ্র-টেবিলের ওপর রাশীকৃত ইংরেজী-বাংলা পত্রিকার পাতা ওলটান।

সাড়ে এগারটা অবধি বিষ্ণু বেশ স্বচ্ছন্দেই কাটিয়ে দিল। আর আধ ঘণ্টা। বিষ্ণু ভাবছিল দুলালকে তারিফ করা উচিত নির্দিষ্ট সময়ের আগে দর্শন না দেবার রীতি মেনে চলার জন্যে।

সাধারণ লোকে তা পারেনা। 'কোত্থেকে আসছেন? ও—ডাক্

ডাক্। ও—থাক্ থাক্—বলে দে বাড়ি নেই—নয়ত বল্ এখন খুব ব্যস্ত। ও আপনি? কী খবর?' এই করে তারা সবদিক সামলাতে গিয়ে কোনদিকই সামলাতে পারে না।

যাই হোক, প্রায় বারটা নাগাদ একজন ফর্সা-ফতুয়া পরা ভৃত্য এসে খোঁজ নিল বিষ্ণুর কী নাম ও কোথা থেকে আসছে সে। বিষ্ণু ইতস্ততঃ করে বলল, 'তোমাদের দুলালবাবু আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। আমায় দেখলে চিনতে পারবেন। নাম শুনে নাও চিনতে পারেন।' ভৃত্য অন্দরে গেল। কিছুক্ষণ পরে দুলাল এসে ঘরে ঢুকল।

বিষ্ণুর চেহারা দেখে দুলাল কিন্তু প্রথমটা চিনতে পারেনি। বরঞ্চ নাম শুনে আন্তরিকতার আতিশয্য দেখিয়ে ফেলল—'আরে, তুই এসে বসে আছিস বাইরের ঘরে! সটান চলে যেতে হয় ভেতরে।'

অনেকদিন পরে দুই বাল্যবন্ধুর দেখা। তখন তাদের ছিল এক শ্রেণী। এখন দুজন দুই শ্রেণীতে। দুলাল সিগারেট কেস খুলে আরম্ভ করল স্কুলজীবনের স্মৃতি-রোমন্থন।

'সিগারেট? এখনও ধরিস নি? তুই একটুও বদলালি না।' বিষ্ণু বলতে গিয়েছিল, 'তুই-ও না।' থেমে গেল।

অনতিবিলম্বে বিষ্ণুর জন্যে এল চা-জলখাবার। সঙ্গে সঙ্গে দুলাল করল মধ্যাহ্নভোজনের নেমন্তন্ন। বললে, 'এতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা। বিকেলের আগে তোকে ছাড়ছি না।'

বিষ্ণু কিন্তু-কিন্তু করতে লাগল। আসল কথাটাই যে তার বলা হয়নি এখনও। সে পথে দাঁড়িয়েছে শুনে দুলাল কী করে তাই সে জানতে চায়। দুলালকে চেনা যাবে তখনই।

বিষ্ণু সঙ্কোচ কাটিয়ে বলে ফেলল সব কথা। নিজের দুরবস্থার কথা প্রথম বার নিজের মুখে বলতে গিয়ে তার গলা ধরে গেল। দুলাল কোনরকম মেয়েলীপনা না করে বলল, 'তোর আবার ভাবনা! অত ভাল রেজাল্ট—চাকরি করতে চাইলে লোকে লুফে নেবে, জামাই হলে তো কথাই নেই।'

—'তা হলেও এলাম তোর কাছে একটা সাহায্যের জন্যে।'

'সাহায্য' কথাটা দুলালের ভাল লাগল না। বললে, 'বিপদের সময় লোকে বন্ধুর কাছেই আগে যায়। তোর 'কিন্তু' হবার কিছু নেই—তুই আমার এখানেই থাক্—মামা তাতে কিচ্ছু মনে করবে না, উলটে খুশি হবে আমার ওপর।'

বিষ্ণু মাথা নীচু করল। দুলালের কাছে সে উপজীবিকা খুঁজতে এসেছিল বটে, কিন্তু উপজীবী হতে আসেনি। নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'তোমার মত বন্ধু সংসারে বিরল। তবে আমি ঠিক সেজন্যে আসিনি।'

বিষ্ণুর 'তুমি' সম্বোধনে দুলাল ক্ষুণ্ণ হল। বললে, 'তোমার নিজের পায়ে দাঁড়ানর ক্ষমতা যে আছে তা আমি জানি। তবে এত বন্ধু থাকতে যখন আমার কাছে আগে এসেছ, আমার দ্বারা যে-টুকু সম্ভব আমি করতে রাজী আছি।'

—'আমি সেই ভরসাতেই এসেছি।' বিষ্ণু জোর করে একটু হাসল —'সম্ভব হলে আমার অনুরোধ তুমি রাখবে তা আমি জানি।'

—'কী অনুরোধ ?'

—'তোমার মামাকে বলে তাঁর থিয়েটারে আমায় ঢুকিয়ে দাও। আমি অভিনয় করব।'

দুলাল চমকে উঠল। বিষ্ণুর কি মাথা খারাপ হয়েছে ? বলে কী ?

'ও-সব মতলব ছাড়ো। এ লাইন তোমার জন্যে নয়। এখন ওঠো—চান করে খেয়ে দেয়ে এক ঘুম ঘুমোও। তারপর মাথা ঠাণ্ডা হলে বিকেলে পরামর্শ করা যাবে'খন।'

দুলাল বিষ্ণুকে যে আতিথেয়তা দেখাল তা মনে রাখার মত। একসঙ্গে বহুভৃত্যের সেবাগ্রহণ করার সুযোগ বিষ্ণু এর আগে পায়নি। এমন বিলাসের সঙ্গে, এত যত্ন করে, কেউ তাকে খাওয়ায়নি।

বিষ্ণু শুনেছিল আগেকার ধনীশ্রেষ্ঠদের খাদ্যবিলাসের গল্প। বড় রূপোর থালা ঘিরে ছোট বড় রূপোর বাটি গোল করে সাজান থাকত দু থাক্—তিন থাক্, খাদকের বাঁদিকে থাকত একখানি সরু লাঠি যার সাহায্যে তিনি দরকার মত বাটিগুলো দূরে কাছে সরাতে পারতেন।

দুলালের আয়োজন প্রায় ঐ রকম। চোখ বুজে বিষ্ণু কিছু খেতে চাইলে নিশ্চয় সে-বস্তুটি খুঁজে পাওয়া যেত অগুন্তি রূপো আর শ্বেত পাথরের একটা না একটা পাত্রে।

খাওয়ার পর্ব চুকলে বিষ্ণুকে শুতে দেওয়া হল এক নরম নির্মল বিছানায়। বিষ্ণু ক্লান্তিতে আর অতিভোজনে ভারি হয়ে উঠেছিল। বিছানায় শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পাঁচ

সন্ধ্যার পর দুলাল নেমে এল গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি আর ফিনফিনে কোঁচান ধুতি পরে। ফটকের মুখে একটা ঘষামাজা সাদা রঙের হুডনামান মোটর দাঁড় করান ছিল। দুলালই চালিয়ে যাবে সেটা—বিষ্ণুকে বলল পাশে বসতে।

গাড়ি চলতে বিষ্ণু জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

—'আগে মামার একটা ফরমাশী জিনিস পৌঁছে দিতে হবে 'উত্তরায়ণ'-এ।'

খানিকদূর গিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দুলাল দোকান থেকে কিনে

আনল মামার ফরমাশী বস্তুটি। বিষ্ণুর অনভ্যস্ত চোখে কেমন কেমন লাগল দুলালের বেপরোয়া ভাব। ফুটপাথের ওপর উঠে গটগট করে কোঁচা দুলিয়ে সে গিয়ে ঢুকল বড় সাইনবোর্ডের মাথায় আলো দেওয়া দোকানে। আবার কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে এল একটা বোতলাকার কাগজের মোড়ক নিয়ে। হুডখোলা গাড়ির পেছনের সিটে রাখল মোড়কটা—যেন লোকে দেখুক বা হাত বাড়িয়ে তুলে নিক তার কিছু যায় আসেনা।

এবার গাড়ি চলতে শুরু করার পর দুলালই পাড়ল সকালের ধামাচাপা কথাটা। বললে, 'এই সব কারণে বলছিলাম যে থিয়েটারের লাইন তোমার জন্যে নয়।'

বিষ্ণু শুকনো গলায় একটু জোর দিয়ে বলল, 'তোমার হয়ত ধারণা যে খারাপের সংস্পর্শে এলে ভালকে খারাপ হতেই হবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল যে ভালর সংস্পর্শে এসে খারাপ কি ভাল হয়না?'

—'সে রকম ভাল লোককে অবতার বলা হয়। তোমার নাম বিষ্ণু হলেও তুমি তো আর অবতার নও!'

—'তা নই, তবে একটা বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

—'কী?'

—'আমার সংস্পর্শে এসে কারুর উপকার হোক বা না হোক, অপরের সংস্পর্শে এসে আমার কোন অপকার হবে না।'

—'জোর গলায় যখন বলছ, মানলাম তোমার মনের জোর আছে। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ? থিয়েটার করে কার কী পরকালের হিল্লে করবে শুনি?'

—'তা জানিনা, তবে অভিনয় করার অপরাধে যখন আমায় আশ্রয় ছেড়ে আসতে হয়েছে, তখন অভিনয়জগতের কাছেই আমি আশ্রয় দাবি করব প্রথম। তোমার মামার সঙ্গে দেখা হলে এই কথাটাই আমি জিজ্ঞেস করব—'বলুন আমার ওপর আপনার কোন কর্তব্য আছে কিনা।'

দুলাল কথাটাকে হালকা করার চেষ্টা করল। হেসে বলল, 'এ

হল অভিমানের কথা। রাগ করে ভাত না খাওয়ার মত। নিজে কষ্ট করে অপরকে জব্দ করা। আমার তো মনে হয় এটা তোমার ডাহা গোঁয়ারতমি।'

বিষ্ণু তবুও জিদ ধরল দুলালের মামার সঙ্গে একবার দেখা করবে। দুলাল হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। মনে হল বিরক্ত হয়েছে।

'উত্তরায়ণ'-এ গাড়ি থামতেই দরোয়ান সেলাম করে দরজা খুলে দিল। বিষ্ণু নামল এক দিক দিয়ে, দুলাল অন্য দিক দিয়ে। দুলাল কিছু না বলা সত্ত্বেও বিষ্ণু দুলালের পেছন পেছন 'উত্তরায়ণ'-এ ঢুকল। দু-একজন কর্মচারীর সঙ্গে দুলালের যা কথাবার্তা হল তাতে বোঝা গেল যে কার্তিকবাবু তখনও আসেন নি। দুলাল যেন আশ্বস্ত হল। যে কর্মচারীটির নাম কালীবাবু তাঁর হাতে কাগজের মোড়কটা দিয়ে বলল, 'আমি এখন চললুম। মামাকে বলবেন আমার এক বাল্যবন্ধু খুব বিপদে পড়েছে। আমি তার একটা ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।'

বিষ্ণু বললে, 'একটু অপেক্ষা করলে হত না ?'

দুলাল কথাটা চাপা দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় কালীবাবু বলে উঠলেন, 'ঐ যে বড়কর্তা এসে গেছেন।'

বিষ্ণু আর দুলাল একই সঙ্গে ঘাড় ফেরাল। কার্তিকবাবুকে চিনতে না পারার কিছু নেই। তিনি সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হেলতে দুলতে আসছেন। সঙ্গে একটি মহিলা।

কার্তিকবাবুর দল দুলালের সামনে পৌঁছতে কার্তিকবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। বিষ্ণুর দিকে চেয়ে দুলালকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইনি ?'

দুলাল ইতস্ততঃ করে বলল, 'আমার স্কুলের বন্ধু। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।' বিষ্ণু হাত তুলে নমস্কার জানাল কার্তিকবাবুকে। তার চোখাচোখিও হয়ে গেল কার্তিকবাবুর সঙ্গিনীর সঙ্গে। তাঁর আট আনা সৌন্দর্য যদি অকৃত্রিম হয়, তবে তাঁকে সুন্দরী বলা উচিত। চোখ দুটো বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। সাজসজ্জা চটকদার কিন্তু বাহুল্যবর্জিত নয়। বিষ্ণু অনুমান করে নিল ইনি 'উত্তরায়ণ'-এর একজন তারকা।

কার্তিকবাবু আর একবার বিষ্ণুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দুলালকে বললেন, 'আমার ঘরে নিয়ে এস।' তারপর এগিয়ে গেলেন।

সেদিন কোন অভিনয় ছিল না। ষ্টেজে আলো জ্বলেনি। আশপাশ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভেতর কার্তিকবাবু যেন সদলবলে হারিয়ে গেলেন।

দুলাল মামার ঘরের দিকে যাবার কোন ইচ্ছেই দেখাল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কালীবাবুর সঙ্গে আজেবাজে কথা বলতে লাগল আর মাঝে মাঝে যেন ইচ্ছে করে অশ্রাব্য ভাষায় দু-একটা কথা বলে আড়চোখে বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল তার মুখের অবস্থা।

বিষ্ণু শেষকালে না বলে পারল না—'চল, যাওয়া যাক।'

দুলাল যেন আকাশ থেকে পড়ল—'কোথায় ?'

'তোমার মামার ঘরে। উনি তো আমাদের যেতে বলে গেলেন।'

দুলাল হেসে উঠল—'আর তুমি তাই বিশ্বাস করলে ? মামার চোখ দেখে বুঝতে পারনি ?'

—'কী ?'

—'তুমি দেখছি একেবারে শিশু। মামাকে দেখে বুঝতে পারলে না যে উনি ইয়ে—মানে রঙে আছেন ?'

—'মানে ?'

—'এর'ও মানে চাও ? মানে হল এই—।' বলে দুলাল ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা পানীয় ঢালবার ভঙ্গীতে মুখের উপর উলটে ধরল। তারপর কাগজের মোড়কটা কালীবাবুর হাত থেকে নিয়ে বলল, 'এটা হল মদের বোতল। এই বোতলে যে মদ আছে তার নাম হুইস্‌কি। যে বেশী মদ্যপান করে তাকে বলে মাতাল। বেশী মদ্যপান করলে মানুষ আর ধাতস্থ থাকে না। তখন সে উলটোপালটা কথা বলে, যেগুলো সাধারণতঃ প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়।'

বিষ্ণু এর আগে কোন মাতালের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলেনি। মাতাল রেগে গেলে বা খুশি হলে কী করে তার জানা ছিল না। তবে

মোটামুটি তার ধারণা ছিল যে মাতাল আর পাগল একই পর্যায়ে পড়ে। এখন দুলালের কাছে সব শোনবার পর তার কী করা উচিত বিষ্ণু ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

এমন সময় কার্তিকবাবু দুলাল আর বিষ্ণুকে ডেকে পাঠালেন। তবুও দুলাল বিষ্ণুকে নিয়ে গেল না। বললে, 'আমি আগে দেখে আসি মামার অবস্থাটা, তারপর যা ভাল হয় করা যাবে। কালীবাবু বরঞ্চ চলুন আমার সঙ্গে।' বলে, দুলাল কালীবাবুর কাঁধে হাত দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিষ্ণু একলা দাঁড়িয়ে রইল। রঙ্গমঞ্চ আর তার চারপাশের অন্ধকারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তার গা শিরশির করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল ঐ অন্ধকারের ভেতর যেন হাজার নাগিনীর বাস। একবার বিষ্ণুকে পেলে তারা ছাড়বে না। আজীবন বন্দী করে রাখবে এই পাতালপুরীতে।

বিষ্ণুর ভয় করতে লাগল। তার বরাত ভাল যে কার্তিকবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি। দেখা হলে এতক্ষণে বোধ হয় সে এই পাতালপুরীতে বাকী জীবনটা কাটাবার দাসখত লিখে দিত। দুলাল তাকে বাঁচিয়েছে।

বিষ্ণু স্থির করে ফেলল যে থিয়েটারে সে ঢুকবে না। দুলালের কথাই ঠিক। এ লাইন তার জন্যে নয়। সরে পড়ার উদ্দেশ্যে সে উলটোদিকে পা বাড়াল।

—'চলে যাচ্ছেন ?'

বিষ্ণু চমকে উঠল। ফিরে দেখল কার্তিকবাবুর সঙ্গিনী।

মেয়েটি বলল, 'বড়কর্তা আপনাকে ডাকছেন।'

বিষ্ণুর অবাক লাগল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে পাঠালেন আমায় ডাকতে ?'

—'হ্যাঁ। তাতে দোষ কী ? আমিও তো তাঁর একজন মাইনে-করা চাকরে। অবশ্য আমার চাকরি হল অভিনয় করা।'

—'আমিও এসেছিলাম আপনার মত একটা চাকরি খুজতে।'

—'জানি। আপনার সব কথা দুলালবাবু বড়কর্তাকে বললেন। দুলালবাবুর ইচ্ছে নয় যে আপনি থিয়েটারে ঢুকে আপনার নিজের জীবন নষ্ট করুন। কিন্তু বড়কর্তা গোঁ ধরেছেন আপনাকে এখানে ধরে রাখবেনই। তাই আমার ওপর ভার পড়ল আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবার।'

—'আমি দুলালের কথাই ভাবছিলুম। হয়ত দুলাল ঠিকই বলেছে। ওর মত বন্ধু হয় না।'

মেয়েটি হেসে উঠল। বিষ্ণু বুঝতে পারল না হাসির মানে। জিজ্ঞেস করল—'হাসলেন যে?'

—'ওমনি। সে যাক। আপনি বোধ হয় এখনও মনস্থির করতে পারেননি। তাহলে বড়কর্তাকে এখন কী বলব তাই বলুন।'

বিষ্ণু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি।'

কার্তিকবাবুর ঘরে ঢুকে মেয়েটি গিয়ে বসল কার্তিকবাবুর পাশে খালি চেয়ারটাতে। বিষ্ণুর বসবার কোন জায়গা ছিল না। সাঙ্গপাঙ্গদের মধ্যে একজন তাই বিড়ি খেতে বাইরে চলে গেল। কার্তিকবাবু খালি চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, 'বসুন।'

বিষ্ণু কাঠ হয়ে বসল। দুলালের দিকে চাইতে দুলাল চোখ ঘুরিয়ে নিল। কার্তিকবাবু আড়চোখে বিষ্ণুর দিকে চেয়ে এক হাত দিয়ে ড্রয়ার হাতড়ে কতকগুলো পুরনো বই বার করলেন। টেবিলের ওপর ঠুকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই থিয়েটারটা হল আমার একটা প্রিয় ব্যবসা। যাবতীয় খরচ এবং সকলকার মাইনে যোগ করলে যা হয় তার চেয়ে বেশী আমার আয় হয় বলেই ব্যবসা চলছে। নইলে আমায় ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হত। সকলকে তাই আমি এই কথাটাই বারে বারে মনে করিয়ে দিই যে প্রত্যেকের যা ন্যায্য দাম, তার চেয়ে কিছু কমই আমাকে দিতে হয়।'

আর সকলে গম্ভীর হয়ে রইল। শুধু মেয়েটি যেন মুখটিপে একটু হাসল।

কার্তিকবাবু এবার শুরু করলেন বিষ্ণুর পরীক্ষা। নানান প্রশ্ন করে শেষকালে কয়েকখানা নাটক এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্রত্যেক বই থেকে একটা করে দৃশ্য পড়ে যান।'

বিষ্ণু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। যদি এত কঠিন পরীক্ষাই দিতে হয় তাহলে দুলালের সুপারিশের দরকার ছিল কী? আর মেয়েটিই বা কেন বলল কার্তিকবাবু গোঁ ধরেছেন তাকে এখানে ধরে রাখবেন?—এই কি তার নমুনা? যাই হোক, বিষ্ণু সুবোধ বালকের মত এক একটা দৃশ্য বেছে পড়ে যেতে লাগল।

খানিকক্ষণ বাদে কার্তিকবাবু জানালেন যে শুধু পড়লে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে এ্যাকশানও দেখাতে হবে। বিষ্ণু প্রমাদ গণল। কারণ বিদ্যেবুদ্ধির সাহায্যে নাটক পড়ে শোনান যায়, কিন্তু হাতমুখ নাড়তে গেলে এমন একটা ক্ষমতা বা অভিজ্ঞতা থাকা দরকার যা বই পড়ে অর্জন করা যায় না। বিষ্ণু স্পষ্ট স্বীকার করল যে জীবনে সে মাত্র একবার অভিনয় করেছে এবং সেই অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে সে এতগুলো চরিত্রের এ্যাকশান দেখাতে রাজী নয়।

দুলাল লাফিয়ে উঠল—'এইজন্যেই আমি আপত্তি করেছিলাম। বিষ্ণু ব্রিলিয়্যাণ্ট স্টুডেণ্ট কিন্তু অভিনয়ের 'অ' জানে না। এখানে ঢুকলে না হবে ওর লাভ, না হবে 'উত্তরায়ণ'-এর। মাঝখান থেকে ওর জীবনটাই গেঁজে যাবে।'

কার্তিকবাবু প্রথমে দুলাল তারপর মেয়েটির দিকে চাইলেন। সেই চাউনির মধ্যে বিষ্ণু যেন অনেক অর্থ খুঁজে পেল। মাথা নীচু করে বলল, 'আমার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল আমি অভিনয়কে জীবিকারূপে বরণ করব। তার জন্যে শিক্ষানবিশী করতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার এই ইচ্ছে পূর্ণ করার জন্যে আর কারুর কোন ক্ষতি হয় আমি তা চাই না।' বলে বিষ্ণু উঠে দাঁড়াল।

কার্তিকবাবু টেবিলের ওপর পেনসিলটা তিনবার ঠুকলেন, হাকিম যেমন আদালত সামলাতে হাতুড়ি ঠোকেন। বললেন, 'আপনার তৈরী

হতে সময় লাগবে। আপাততঃ আপনার মাইনে হল মাসে পঞ্চাশ টাকা। সময় হলে আমি নিজেই বাড়িয়ে দেব। আর—।' বলে তিনি ড্রয়ার থেকে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বার করে বিষ্ণুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বাকী কথাটুকু শেষ করলেন, 'একমাসের আগাম মাইনে—সুবিধে মত শোধ করে দেবেন।'

বিষ্ণু বুঝল মেয়েটির কথাই ঠিক। কার্তিকবাবু গোঁ ধরেছেন যে 'উত্তরায়ণ'-এর পাতালপুরীতে তাকে আটক রাখবেনই। কিন্তু এ চাকরি দুলালের সম্মতির বিরুদ্ধে তা বুঝতে বিষ্ণুর বাকী ছিল না। এখন প্রশ্ন শুধু বিষ্ণু কার ঋণ স্বীকার করবে—দুলালের না দুলালের মামার ? বিষ্ণু কী ভেবে একমাসের আগাম মাইনেটাই গ্রহণ করল। তার মনে হল দুলাল যদি তাকে ভুল বোঝে সে ভুল ভাঙ্গা তার পক্ষে মোটেই কষ্টকর হবে না।

বিষ্ণু কার্তিকবাবুকে ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে চলে যাচ্ছিল। কার্তিকবাবু বলে উঠলেন— 'দাঁড়ান। চলে যাচ্ছেন, থাকবেন কোথায় ?'

বিষ্ণু লজ্জিত হয়ে বলল, 'দুলাল আমাকে বলেছিল আপনার বাড়িতে থাকতে—আর বলেছিল যে আপনি তাতে খুশিই হবেন—কিন্তু আমি আর আপনার ঋণ বাড়াতে চাই না।'

—'কিন্তু আমারও তো একটা কর্তব্য আছে। আপনি ঢুকলেন আমার থিয়েটারের অভিনেতা হয়ে—কিসে আপনার এবং সেই সঙ্গে আমার মর্যাদা রক্ষা হয় সেটাও তো আমায় দেখতে হবে !'

—'অতদূর আমি ভাবিনি।'

কার্তিকবাবু হেসে বললেন, 'আপনি এখনও ছেলেমানুষ। সংসারে অনভিজ্ঞ। কিছুদিন আমার বাড়িতে থাকলেই ভাল করতেন। যাক, আমি দুলালকে বলছি আপনার জন্যে একটা ছোটখাট বাড়ি ঠিক করে দিতে।'

দুলাল বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাড়ি কোথায় পাব ? তাছাড়া বিষ্ণু কি ঐ মাইনেতে বাড়িভাড়া দিয়ে চালাতে পারবে ? তার চেয়ে

কাছাকাছি কোন ভাল মেসে ওর জন্যে একটা সিট যোগাড় করে দিতে বলেন তো দেখি।'

বিষ্ণু তাতেই মত দিতে যাচ্ছিল। কার্তিকবাবু বললেন, 'মেসে থাকলে অনেক অসুবিধে। এখন বেশ কিছুদিন ওঁকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একা একা রিহার্সাল দিতে হবে। তাছাড়া নিয়মিত থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গেলে খাওয়া দাওয়া বা যাওয়া আসার সময়েরও ঠিক থাকবে না। আমার তাই মনে হয়, অন্ততঃ কয়েক মাস ওঁর উচিত একটা বাড়ি বা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকা।'

মেয়েটি এবার যেন ভরসা পেয়ে বলে উঠল যে তার বহুদিনের পুরনো স্যাকরা বলছিল তাদের পাড়াতে নাকি একটা ছোট্ট বাড়ি খালি হয়েছে। তবে বাড়িওলা ডবল ভাড়া চায়।

—'ডবল ভাড়া?' কার্তিকবাবু রেগে উঠলেন। 'একি মগের মুলুক নাকি? কত ভাড়া চায় শুনি?'

মেয়েটি বললে, 'বোধ হয় আগে ছিল পনের এখন চায় তিরিশ।'

—'ও, তাই বল। তিরিশ টাকার নীচে আজকাল আর কে বাড়ি দিচ্ছে?'

দুলাল সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিল—'কিন্তু পঞ্চাশ টাকা থেকে তিরিশ টাকা গেলে বিষ্ণু খাবে কী?'

কার্তিকবাবু মাথা নাড়লেন—'ঠিক বলেছ। তাহলে বাড়িভাড়াটা আমারই দেওয়া উচিত। বেশ—তাই হবে। তুমি আজই যাও—একেবারে বাড়ি ঠিক করে এঁকে সেখানে বসিয়ে দিয়ে তারপর এস। সঙ্গে টাকা না থাকে তো—।'

দুলাল জানাল যে টাকার দরকার হবে না। মেয়েটির কাছ থেকে স্যাকরার ঠিকানা নিয়ে বিষ্ণুকে বলল, 'চল, আর দেরি করে লাভ নেই।'

ওরা দুজনে উঠে দাঁড়িয়েছে এমন সময় কার্তিকবাবু আবার বাধা দিলেন।—'একটা কথা ছিল। একটু বসুন।'

বিষ্ণু বসল। কার্তিকবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনাকে আর একটা কাজ করতে হবে।'

বিষ্ণু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। কার্তিকবাবু জানালেন, 'আপনার নামটা বদলে ফেলতে হবে।'

বিষ্ণু ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। কার্তিকবাবু তার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি বাতিল করে দিতে চান দিন, কিন্তু যে নামের গৌরব বাড়ানর জন্যে সে এতদিন কৃচ্ছসাধন করে এল কার্তিকবাবুর খুশিমত এক কথায় তাকে বর্জন করতে হবে, এ কী রকম যুক্তি ? রঙ্গালয়ে নাম লিখিয়েছে বলে তাকে আর সঙ্গে রাখা চলবে না ? আর, যদি সে কোনদিন অভিনয় করে প্রসিদ্ধি লাভ করে তবে সব সম্মান কি পাবে তার এক ভাড়া করা নাম—তার আসল নাম নয় ?

কার্তিকবাবু বোধ হয় বিষ্ণুর মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। হেসে মুখ ঘোরালেন মেয়েটির দিকে। বললেন, 'এই যে দেখছেন সুন্দরী মেয়েটি—ইনি আমাদের একজন প্রধান অভিনেত্রী। এঁর নাম রাখা হয়েছে 'কাজরী'। শুদ্ধু এই নামের আকর্ষণে আদ্ধেক লোক টিকিট কেটে আসে এঁকে দেখতে—ইনি অভিনয় কেমন করেন সে কথাটা ওঠে পরে।'

—'এঁর কথা বলতে পারি না। কিন্তু আমার নাম শুনে লোকে টিকিট কেটে আমায় দেখতে আসবে, আমার অভিনয় দেখতে নয়, এ রকম একটা সম্ভাবনা আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

কার্তিকবাবু কর্তাব্যক্তি চালে বললেন, 'যান যান—যে কাজে যাচ্ছিলেন যান। আপনারা দুটো পাশ করেই মনে করেন সব শিখে ফেলেছেন। কিন্তু আমরা শিখেছি ঠেকে—হাজার হাজার টাকা দণ্ড দিয়ে। পাবলিক কী জীব তা আমরা হাড়ে হাড়ে জানি। কিন্তু আপনাদের বইতে তো সব কথা লেখা থাকে না—লিখতে গেলে অনেক অপ্রিয় সত্য বেফাঁস হয়ে যায়। যাকগে ওসব কথা। আপনারা বেরিয়ে পড়ুন।'

ছয়

রাস্তার নাম আনন্দ নিয়োগী লেন। স্যাকরার নাম ভগবান। দুলাল আর বিষ্ণু হিমসিম খেয়ে গেল ঠিকানা খুঁজে বার করতে। শেষকালে স্যাকরাকে পেয়ে দুলাল বললে, 'তুমি ভগবানই বটে। প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ না হলে তোমার দেখা পাওয়া যায় না।'

ভগবান সরল হাসি হেসে তার গোঁফের তলায় দোক্তাজীর্ণ দাঁতগুলো বার করল। কাজরীদিদি ভাড়াটে পাঠিয়েছেন শুনে সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটল বাড়িওলার কাছে। তিনি দোতলায় উঠে গিয়েছিলেন। একবার ওপরে উঠলে সাধারণতঃ নীচে নামেন না। ভগবান হাতে-পায়ে ধরে তাঁকে ডেকে এনে একতলার বসবার ঘর খোলাল। দুলাল আর বিষ্ণুকে আপ্যায়িত করে নিয়ে গেল ঘরে।

বাড়িওলা গোপীকান্তবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন। যা উত্তর পেলেন তাতে তাঁর মন উঠল না। শেষপর্যন্ত ভগবান বললে সে জামিন। কাজরীদিদি যখন পাঠিয়েছেন তখন ভাড়াটে ফিরে যাবে এ হতেই পারে না। বাধ্য হয়ে গোপীকান্তবাবু তাঁর ফতুয়ার পকেট থেকে চাবির গোছা বার করে আলমারি খুললেন। এক মাসের আগাম ভাড়া নিয়ে রসিদ ও বাড়ির চাবি ভগবানের হাতে জিম্মা করে দিলেন। দুলাল চলে গেল।

না-লোটা না-কম্বল বিষ্ণু খালি বাড়িতে গিয়ে উঠল। ভগবান জিজ্ঞেস করল, 'আজকের আহারাদি ?'

—'ক্ষেপেছ তুমি ! আমার ঐ বন্ধুটি মানে দুলাল যা খাইয়েছে সে কি মনে করেছ এক বেলায় হজম হবে ? কলে জল আছে, হাতের আঁজলা আছে। আজকের মত ঐ যথেষ্ট।'

—'আপত্তি না থাকলে বলতুম এ বেলাটা গরীবের বাড়ি সেবা নিতে।'

—'তার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সেবা নেওয়া তো পালিয়ে যাচ্ছে না।' প্রথম দিনই বউনি করার দরকারটা কী?'

ভগবান নিরাশ হল। বললে, 'আমাদের পাড়ায় এসে পয়লা দিনই উপবাস করলে আমাদের অমঙ্গল হবে। আমি বাড়ি গিয়ে সত্যনারায়ণের শিন্নি পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাই না হয় একটু মুখে দেবেন। আর কালকে কী কী লাগবে তার একটা ফর্দ করে দিন আমি প্রাতঃকালেই সব ব্যবস্থা করে দেব। কোন অসুবিধে হবে না আপনার। মুদী, কয়লা, কাঠ সব পাড়াতেই মিলবে—আমার পরিবার না হয় কাল সকালে উনুনটা গড়ে দিয়ে যাবে।'

ভগবানের কথায় বিষ্ণুর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। এ যুগে এই লোক? বিনা স্বার্থে, যেচে, পরের জন্যে কষ্টস্বীকার? বিষ্ণু ভগবানের হাতদুটো ধরে বলল, 'তোমার নামকরণ সার্থক হয়েছে—তুমি সত্যিই ভগবান।'

পরদিন ভগবান আর তার বৌ জিনিসপত্র কিনেকেটে বিষ্ণুর সংসার গুছিয়ে দিল। ভগবান বললে, 'রান্নাটা আপনি নিজের হাতেই করুন। আপনাকে আর কোন ভাবনা ভাবতে হবে না।' ভগবানের ইচ্ছে ছিল সে আর তার ছেলে-বৌ বিষ্ণুর আর সব ঝক্কি ঘাড়ে নেয়—ঘর ঝাঁট দেওয়া, মোছা, বাজার করা, উনুন ধরান, কাপড় কাচা। বিষ্ণু তাতে রাজী নয়। বললে, 'আমি একটা লোক। নিজের কাজ নিজে করতে পারব না, আমায় কি এতই অপদার্থ ঠাউরেছ?'

এক টাকার টানাটানি ছাড়া সংসার করতে বিষ্ণুর আর কোনও কষ্ট হচ্ছিল না। দুশ্চিন্তা লাঘব করবার জন্যে ভগবান তো ছিলই—তার ওপর

অনেক বন্ধু, জুটে গেল পাড়ার একপাল ছোট ছেলেমেয়ে, যাদের নিয়ে হৈ হৈ করে বিষ্ণুর দিনগুলো ভালই কাটতে লাগল। পরকে আপন করতে যাদের সময় লাগে না তাদের সামলান মুস্কিল। কিছুদিনের মধ্যেই বিষ্টুদার বাড়িকে তারা খেলার মাঠ করে ফেলল—চোরচোর, লুকোচুরি আর যত সব হুড়োহুড়ির খেলা তারা বিষ্টুদার বাড়ি ছাড়া আর কোথাও খেলে সুখ পেত না।

মাঝে মাঝে মা-বাবারা ক্ষেপে গিয়ে ছেলেমেয়েদের আটক রেখে দিতেন। বিষ্ণুর তখন দায়। খোঁজ নিতে হত—কী ব্যাপার? তাকেই ছোটাছুটি করতে হত আসামীদের হয়ে ওকালতি করতে। আবার যে কে সেই।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের এতটা সুখ কপালে সইল না। হঠাৎ একদিন তাদের বিষ্টুদার বাড়িতে এক অতিথির আবির্ভাব হল—নাম তাঁর নারকোলপিসি। দেশে তাঁর বাড়িতে গেলেই নাকি ভাইপো-ভাইঝিদের তিনি নানা রকমের নারকোলের খাবার খাওয়াতেন। বিষ্টুদা আর তার ভাইবোনেরা ভাবত নারকোলপিসির বাড়ির উঠোনে যে নারকোলগাছটা আছে তাই থেকে পিসিমা যখন ইচ্ছে নারকোল পাড়েন আর খাবার তৈরি করে সবাইকে খাওয়ান—নারকোল নাড়ু, চন্দ্রপুলি, নারকোলের ছাঁচ—আরও কত কী!

যাই হোক, নারকোলপিসি বিষ্ণুর বাড়িতে এসে উঠলেন এক ঘটনাচক্রে। হঠাৎ একদিন তাঁর সঙ্গে বিষ্ণুর দেখা কালিঘাটের বাজারে। নারকোলপিসি বিষ্ণুকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। বহুদিন দেশের পাট তুলে দিয়ে তিনি পরম সুখে কলকাতাবাস করছিলেন তাঁর চাকরে ভাশুরপোর বাড়িতে। কিন্তু নারকোলপিসির এমন অদৃষ্ট, ভাশুরপোর বৌ মারা গেল আর বছর না ঘুরতে তার আর এক বৌ ঘরে এল। এই দ্বিতীয়পক্ষ যে কী রকম মেয়েমানুষ নারকোলপিসি

বলে বোঝাতে পারবেন না। তাঁর প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলল ঐ একরত্তি মেয়ে। দগদগে করে সিঁদুর দেয় সিঁথিতে আর কোমর বেঁধে, কোমর বেঁকিয়ে ঝগড়া করে—যা মুখে আসে তাই বলে। ভাশুরপো মুখ বুজে থাকে, তার চোখ দুটো কেবল গাইয়ের মত মিটমিট করে।

নিজের দুঃখের কাহিনী শোনাবার পর পিসিমা যখন শুনলেন যে বিষ্ণুও বাবার কাছ থেকে চলে এসে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে আছে, তিনি বিষ্ণুর মতামতের অপেক্ষা না করে সেইদিনই পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে হাজির হলেন আনন্দ নিয়োগী লেনে। বিষ্ণু কোন আপত্তি করল না। বরঞ্চ পিসিমার হাতে সংসারের ঝক্কিঝঞ্ঝাট তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

সাত

'উত্তরায়ণ'-এ বিষ্ণু ছোটখাট ভূমিকায় মাঝে মাঝে নামছিল—বেশীর-ভাগ অনুপস্থিত অভিনেতার জায়গায়। যাকে বলে, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।

নামকরণের প্রশ্নটা তাই ধামাচাপা ছিল। বিষ্ণুর আসল নামই কখন সখন ছাপার অক্ষরে বেরচ্ছিল 'আরও অনেকে'র মধ্যে।

হঠাৎ একদিন কার্তিকবাবু কথাটা পেড়ে বসলেন—'কী হল আপনার নামের? ভাল নাম কিছু খুঁজে পেলেন?'

বিষ্ণু একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। কার্তিকবাবুর বক্তব্যটা তাই বুঝতে দেরি হল।

তিনি আবার বললেন,'নতুন বইতে আপনাকে এবার একটা বড় পার্টে ট্রাই করব। আসছে বিষ্যুতবার থেকে রিহার্সাল—কাগজে বিজ্ঞাপনও সেদিন থেকে বেরবে। তার আগে আপনার নতুন নাম ঠিক করে ফেলবেন।'

বিষ্ণু অনেক করে কার্তিকবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে মানুষ বড় হলে তার নাম বড় হয়—অর্থাৎ ঘোড়া গাড়িকে টানে, গাড়ি ঘোড়াকে নয়। কার্তিকবাবু কিন্তু বিষ্ণুর কথা কানেই তুললেন না। বিষ্ণু বড় হবে কি হবে না এ তাঁর সমস্যা নয়। তিনি চান যে তাঁর থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে বা প্রোগ্রামে যে যে নাম বড় হরফে ছেপে বেরবে তাতে যেন চুম্বকশক্তি থাকে। কথা না বাড়িয়ে তিনি শুধু বললেন, 'রবিবারের মধ্যে আপনার কাছ থেকে ভাল নাম না পেলে আমরাই আপনার একটা নাম পছন্দ করে দেব।'

বিষ্ণু প্রতিবাদও করেনি, নতুন নাম দাখিলও করেনি। যে নামকে সে ভালবাসে তাকে ত্যাগ করে অন্য নাম পছন্দ করার মধ্যে কোন কারণ খুঁজে পায়নি সে।

কয়েকদিন পরে কাগজ খুলে 'উত্তরায়ণ'-এর বিজ্ঞাপন পড়তে গিয়ে বিষ্ণু চমকে গেল। আগামী নাটক 'পতঙ্গ'-এর বিজ্ঞাপনে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে এক নতুন নাম। এ তারই নাম। বিষ্ণু নামটা অনেকবার পড়ল। শেষে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে নামটা খুব পছন্দসই না হলেও নিন্দনীয় নয়।

বিকেলে 'পতঙ্গ'-এর রিহার্সাল ছিল। দেখা হতেই কাজরী জিজ্ঞেস করল, 'নাম পছন্দ হয়েছে?'

বিষ্ণু বলল, 'আমার পছন্দ না হলেও বলব যিনি নামকরণ করেছেন তাঁর পছন্দজ্ঞান আছে।'

—'এ আবার কোন ধরনের কথা? খেয়ে কি কেউ বলে যে আমার ভাল লাগেনি তবে রান্না ভাল হয়েছে?'

—'বললে দোষ হয় না। আমার ভাল না লাগলেই যে জিনিসটা খারাপ হবে এমন কোন কথা নেই।'

কাজরী যেন একটু অস্বস্তি বোধ করল। বললে, 'আসল কথা আপনার নাম পছন্দ হয়নি। তাহলেও আমি আপনাকে 'অভিমন্যুবাবু' বলেই ডাকব।'

—'কিন্তু আমার নাম হল বিষ্ণু।'

—'আজ থেকে তার সঙ্গে আমার আড়ি।' বলে কাজরী মুচকি হেসে আড়ি দেখিয়ে চলে গেল।

বিষ্ণুর বাড়িভাড়া কার্তিকবাবুর দেবার কথা। কিন্তু সেই যে এক মাসের আগাম ভাড়া দুলাল দিয়েছিল তারপর থেকে কার্তিকবাবু আর বাড়িভাড়া দেবার নাম করেন নি। বিষ্ণুর বলবার কিছু ছিল না। দুলাল তো আগেই তাকে সাবধান করে দিয়েছিল যে মাতাল কথা দিলে প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। যাই হোক, কয়েক মাস অপেক্ষা করেও বিষ্ণু যখন দেখল যে কার্তিকবাবু ভাড়ার ব্যাপারটা একদম হজম করে বসে আছেন, সে বাধ্য হয়ে দু-একটা টিউশানী যোগাড় করার জন্যে উঠেপড়ে লাগল। ওদিকে তার পোষ্ট অফিসের খাতায় যা ছিল তাও গেল ফুরিয়ে, সোনার আংটি, বোতামগুলোও একে একে বেচে ফেলতে হল।

খরচা কমাবার অন্য উপায় ছিল সংসার তুলে দিয়ে মেসে ওঠা। কিন্তু আনন্দ নিয়োগী লেনে নারকোলপিসি আর ছোট বন্ধুদের নিয়ে যে আনন্দনীড় সে বেঁধেছিল, অর্থাভাবে তা ভেঙ্গে দিতে বিষ্ণুর মন চাইল না। সে কষ্টেসৃষ্টে আনন্দনীড় আঁকড়ে পড়ে থাকাই সাব্যস্ত করল। ফলে তার বাড়িভাড়া বাকী পড়তে লাগল।

'পতঙ্গ' মঞ্চস্থ হবার দিন কার্তিকবাবুর উৎসাহ দেখে কে! অভিনয়ান্তে বিরাট পানভোজনের ব্যবস্থা তো করেছিলেনই, তাছাড়া ঘোষণা করলেন যে বইখানা উতরলে সবাইকে মোটা রকমের একটা বোনাস দেবেন।

পানভোজনে বিষ্ণুর উৎসাহ ছিল না। অভিনয় শেষ হতে সে সাজঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে বাড়ি যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। এমন সময় একজন বেয়ারা এসে খবর দিল যে চারনম্বর বক্সে দুজন মহিলা তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বসে আছেন।

বিষ্ণুর মেজাজটা বিগড়ে ছিল। কারণ বড় পার্টে পাবলিক ষ্টেজে প্রথম নামলেও অভিনয় সে আজ ভালই করেছিল। অথচ একটা প্রশংসাধ্বনি শুনিয়ে কৃতার্থ করেনি কেউ। কাজরীকে নিয়ে সবাই মত্ত। তাকে ঘিরে নরক গুলজার করছেন কার্তিকবাবু আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা। এমনকি দুলালও সম্পূর্ণ উদাসীন। একবার এসে পিঠে হাতও দিল না!

দুজন মহিলা দেখা করতে চান শুনে বিষ্ণু খানিকটা সান্ত্বনা পেল। এঁরাই প্রকৃত সমঝদার। গুণীর গুণকে বড় করে দেখেন, দোষকে নয়। বিষ্ণু যাবার আগে কার্তিকবাবুকে বলে আসতে গেল।

বিষ্ণু চলে যেতে চায় শুনে কার্তিকবাবু টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। —'না না—তা কি হয়? আপনার অনারে আজ এই পার্টি আর আপনি না খেয়ে চলে যাবেন? বসুন, বসুন—চমৎকার পার্ট হয়েছে আপনার—একসেলেণ্ট—এর পরের বইতে আপনাকে হিরো করে দেব।'

দুলাল, কাজরী এবং আরও অনেকে বিষ্ণুকে অনুরোধ করল থাকবার জন্যে, কিন্তু বিষ্ণু চারনম্বর বক্সের অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়ল। জোড়হাত করে বলল, 'আমার আজ এক জায়গায় নেমন্তন্ন আছে। যাঁদের বাড়ি নেমন্তন্ন তাঁরা আমায় নিতে এসেছেন। আজকের দিনটা আমায় ক্ষমা করুন।'

এ কথার পর কার্তিকবাবু আর জোর করলেন না। বললেন, 'তবে যান।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিষ্ণু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

আট

বিষ্ণু স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে চারনম্বর বক্সের সমঝদার দর্শক দুজন আর কেউ নয়—স্বয়ং শান্তা আর তার দিদিমা। বিষ্ণু চমকে উঠেছিল দূর থেকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আপনারা?' সঙ্গে সঙ্গে দিদিমার চেয়ারের কাঁধটা ধরে পেছনে বসে পড়ল। দিদিমা ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'তুমি শান্তার ওপর রাগ করে ওর সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিলে—বুঝলুম না হয় ল্যাটা চুকে গেল, ও দুদিন বাদে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। কিন্তু সেই সঙ্গে তুমি আমায় ত্যাগ করলে আমি কোথায় যাই বলত ভাই?'

বিষ্ণু লজ্জিত হয়ে বললে, 'এ আপনি কী বলছেন? আমি শান্তার ওপর রাগ করেছি এ কথা আপনাকে কে বললে?'

শান্তা বলে উঠল—'আমরা জানতে পেরেছি যে আমার কথায় আপনি কলেজে থিয়েটার করেছিলেন বলে আপনাকে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে—তা বলে এ ভাবে আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া আপনার মোটেই উচিত হয় নি।'

বিষ্ণু দিদিমাকে বলল, 'এ সব শান্তার মনগড়া অভিযোগ। আমার

বরাতে যদি বাড়ির ভাত লেখা না থাকে আমি শান্তাকে কেন দোষ দেব বলুন ত দিদিমা!'

দিদিমা চোখ মুছলেন। শান্তাও মুখ ফেরাল। দিদিমা বললেন, 'তুমি ভাই আজ একবারটি চল আমাদের সঙ্গে। শান্তার বাবা ভয়ানক রেগে আছেন শান্তার ওপর। তুমি ছাড়া কেউ তাঁকে শান্ত করতে পারবে না।'

বিষ্ণু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'চলুন।'

শান্তাদের মোটরে যেতে যেতে বিষ্ণু জানতে পারল অনেক কথা। তার বাড়ি ছাড়ার পর কলেজে কী রকম হৈ হৈ পড়ে যায়! বেচারী শান্তার অবস্থা হয় সবচেয়ে শোচনীয়। সে তো কলেজ যাওয়া ছেড়েই দিয়েছে এক রকম। নন্‌কলেজিয়েট হওয়া ছাড়া তার গতি নেই। এদিকে বিষ্ণুর খোঁজ কেউ দিতে পারে না। কত আজে বাজে গুজব। দুদিন তো শান্তা খালি কেঁদেছে—খায়নি, ঘুমোয়নি। তারপর, এতদিন পরে কাল এক টুকরো খবরের কাগজে 'উত্তরায়ণ'-এর বিজ্ঞাপন পড়তে গিয়ে বিষ্ণুর নাম হঠাৎ আবিষ্কার করল শান্তা। তাই দেখেই তো ছুটে আসা। আজ আবার জানা গেল বিষ্ণু 'অভিমন্যু' খেতাব পেয়েছে।

শান্তা বলে উঠল—'ও আবার নাম নাকি? কে রেখেছে শুনি?'

বিষ্ণু হেসে বলল, 'আমি নয়।'

বিষ্ণু এসেছে শুনে শান্তার বাবা গুরুপদবাবু তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। ভাইবোনেরাও ভিড় করল ড্রয়িংরুমে। দিদিমা মিষ্টি কথায় ভিড় সরিয়ে দিয়ে বিষ্ণু আর গুরুপদবাবুকে কথা বলবার সুযোগ দিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন বিষ্ণু খেয়ে যাবে।

গুরুপদবাবু সস্নেহে গালাগাল দিলেন প্রচুর। বললেন, 'এ তো

হয়েদরে প্রতিশোধ নেওয়াই হল—শান্তার ওপর—মা হয় তোমার বাবার ওপর। তুমি সুইসাইড করলেও ঠিক একই প্রশ্ন উঠত।'

—'কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি স্বেচ্ছায়, মনে কোন অভিযোগ না রেখে, এই চাকরি নিয়েছি।'

—'ঘোড়ার ডিমের চাকরি। তোমার চাকরি আমায় ঠিক করতে দাও। তাহলেও বুঝব শান্তা তোমার যা অনিষ্ট করেছে তার কিছুটা ক্ষতিপূরণ আমার দ্বারা হল।'

—'ঐখানেই আমার আপত্তি। আমি মানতে রাজী নই যে কেউ আমার কোন ক্ষতি করেছে।'

গুরুপদবাবু শেষপর্যন্ত তর্কযুদ্ধে হার মেনে উঠে পড়লেন। অবশ্য তাঁর আফসোস অনেকখানি দূর হয়ে গিয়েছিল বিষ্ণুর কথায়।

দিদিমা আর একবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন খাবার সময়। বললেন, বিষ্ণু সবাইকে খুশি করতে পারত যদি সে গুরুপদবাবুর সুপারিশে কোন ভাল চাকরি নিত—আর, গুরুপদবাবুর মত নামকরা ইঞ্জিনিয়ারের জানাশুনো সাহেবগোষ্ঠী তো নেহাত ছোট নয়, দু শ-আড়াই শ টাকার চাকরি তিনি এখুনি করে দিতে পারেন—এটুকু 'উপকার' বিষ্ণু অনায়াসে করতে পারত—এ কথা ঠেস দিয়ে জানালেন দিদিমা।

বিষ্ণুকে কিন্তু টলান গেল না।

শান্তা যখন স্কুলে পড়ত তখন হেড-মিস্ট্রেস কমলাদির সঙ্গে তার একটা মধুর অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। স্কুল ছাড়ার পরও শান্তা মাঝে মাঝে কমলাদির বাড়ি গিয়ে সে সম্বন্ধ বজায় রেখেছিল।

কমলাদিকে অদ্ভুত লাগত শান্তার। একদিন তিনি সুন্দরী ছিলেন তা এখনও বোঝা যায়। অথচ কেন যে তিনি চিরকুমারী রয়ে গেলেন শান্তা ভেবে পেত না। কমলাদিকে বিশেষ করে পবিত্র মনে হত এইজন্যে। কমলাদির কাছে গেলে শান্তার মনে হত, যত বড় সমস্যাই হোক কমলাদি ঠিক তার নিষ্পত্তি করে দেবেন। মন যতই অশান্ত হোক কমলাদির কথায় শান্ত হবেই।

বিষ্ণুকে কলেজের অভিনয়ে নামাতে পেরে শান্তা মনে মনে এমন একটা আনন্দ অনুভব করেছিল যা বলাও যায় না লুকোনোও যায় না। কিন্তু যখন বিষ্ণুর বাড়ি ছাড়ার খবরটা জানাজানি হয়ে গেল, শান্তা প্রথমেই ছুটে গিয়েছিল কমলাদির কাছে। কমলাদি বলেছিলেন, 'বিষ্ণুকে খুঁজে না বার করলে, তার সঙ্গে কথা না বললে, কিছুই জানা যাবেনা—প্রমাণ হবে না তুমি ওকে কতখানি চিনেছ।'

সেদিন কমলাদির কথায় শান্তার আঁতে ঘা লেগেছিল। বিষ্ণুকে সে চিনতে পারেনি এ কথা শুনে তার রাগ হয়েছিল মনে মনে।

আজ শান্তা বুঝতে পারল নিজের ভুল। কমলাদির কাছে গিয়ে বলতে হল—আমি চিনিনি বিষ্ণুকে, যে বিষ্ণু' আমার বাবার সাহায্য নিতে চায়না, যে আমার মান রাখতে রাজী নয়, যে আমার বন্ধুত্ব

স্বীকার করে না, যে সমাজকে গ্রাহ্য করে না, যে নিজের মুখে চুনকালি মেখে সার্কাসের ক্লাউনের মত অপরকে ব্যঙ্গ করে বেড়াতে দ্বিধা করে না, এক অকিঞ্চিৎকর জীবনকে আদর্শ বলে মেনে নিতে যার কোন খেদ নেই, লজ্জা নেই।

কমলাদি বললেন, 'আমার মনে হয় ওর সিদ্ধান্তের পেছনে খামখেয়ালীপনা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কোন মোহ নেই, লোভ নেই। সুতরাং ওকে ফেরাতে গেলে এক যুক্তির জোর ছাড়া কোন জোরই খাটাতে পারবেনা তুমি।'

শান্তা কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। কমলাদি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, 'ভালবাসার যদি কোন শক্তি থাকে সেও আসলে যুক্তিরই জোর। যেখানে যুক্তি নেই সেখানে ভালবাসাও শক্তিহীন।'

শান্তা মাথা হেঁট করে বসে রইল। সত্যিই কি তার কিছু নেই যা দিয়ে সে বিষ্ণুকে ফিরিয়ে আনতে পারে? তাহলে কি এই কথাই ঠিক যে 'উত্তরায়ণ'-এ যোগ দেবার পর বিষ্ণু শান্তার সঙ্গে দেখা করেনি শুধু এইটুকু বুঝিয়ে দিতে যে তার নতুন যাত্রাপথে শান্তার সাহচর্য নিষ্প্রয়োজন?

দশ

ছুটির দিন সকালে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উৎপাতে বিষ্ণুর ঘুম ভাঙ্গবে এই ছিল তার অদৃষ্ট। দলের মধ্যে কেউ কেউ ছিল

রেলিং ও পাঁচিল টপকাতে অভ্যস্ত। বিষ্টুদার বাড়ির কোন দরজা কোনখান থেকে কী ভাবে খোলা যায় তার কায়দাগুলো ছিল তাদের নখদর্পণে। কাজেই রাত্তিরে নারকোলপিসি সব দরজা ভাল করে বন্ধ করে শুলেও ছুটির দিন সকাল হতে না হতেই ভোজবাজির মত ছেলেমেয়েরা ঢুকে পড়ত বিষ্টুদার শোবার ঘরে।

নারকোলপিসি গজগজ করতেন—'কী দস্যি সব আজকালকার ছেলেপুলে! আর ধন্যি তাদের বাপ-মা। নিজেরা পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন আর এই সাত সকালে ছেলেমেয়েগুলো যে পাড়া মাত করে বেড়াচ্ছে সেদিকে কারুর হুঁশ নেই। শুধু কি তাই? যার বাপ-মা যা না দেবে বিষ্টুর কাছে তার বায়না। পেনসিল রে, রবার রে, ঘুঁড়ি রে! অত কিসের আবদার বাপু? এ কি তোদের মায়ের পেটের ভাই না দাদামশাই? ভালমানুষ বলে কি যত জুলুম ওর ওপর?'

একদিন বাদল রুখে দাঁড়াল। বিষ্টুদা তাদের আপনার জন নয় এ খোঁটা সে সহ্য করতে পারল না। বলে বসল— 'হ্যাঁ- হ্যাঁ, বিষ্টুদা যেন তোমারই মায়ের পেটের ভাই না দাদামশাই।'

—'কী বললি?' বলে নারকোলপিসি খুন্তি হাতে দাঁড়িয়ে উঠলেন— 'তবে রে!'

বাদল এমন করে চেঁচিয়ে উঠল যেন নারকোলপিসি সত্যিই তাকে খুন্তিপেটা করেছেন। চেঁচাতে চেঁচাতে সে বিষ্টুদার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ছেলেমেয়ের দল অন্য দিক থেকে ছুটে এসে সমস্বরে চেঁচাতে লাগল—'পিসিমা আসছে, পিসিমা আসছে!'— আর হুড়মুড় করে দরজার ওপর গিয়ে পড়ল সকলে, পিসিমার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে। সঞ্জয় খুশীর কাঁধে চড়ে দরজায় শেকল দিতে গিয়ে আছাড় খেল। সেও আর এক মজা। চেঁচামেচি হট্টগোলে পাড়ার সব মা-বাবা জেনে গেলেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের খুঁজলে এখন কোথায় পাওয়া যাবে।

এমন সময় রাস্তার দিকের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হল। বিষ্ণু

কষির কাপড়টা গুঁজতে গুঁজতে উঠে গেল। দরজা খুলে সামনেই দেখে—শান্তা। অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'এস—এস—ভেতরে এস—হঠাৎ কী মনে করে? আমার ঠিকানা কে দিল?'

শান্তা ঘরে ঢুকতে বিষ্ণু একটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বসতে বলল।

ছেলেমেয়ের দল হঠাৎ চুপ হয়ে গিয়েছিল। তবে বিষ্টুদার নতুন অতিথিকে দেখে তারা যে খুশি হয়নি তা তখুনি বোঝা গেল। সুড়সুড় করে সবাই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল একে একে।

বিষ্ণু বললে, 'এরা সব আমার বন্ধু।'

শান্তার সঙ্গে দু-একজনের চোখাচোখি হতে তারা এক দৌড়ে পালিয়ে গেল।

শান্তা বললে, 'ভালই আছ দেখছি।'

—'আমায় কি আরও শোচনীয় অবস্থায় দেখবে বলে আশা করেছিলে?'

—'কেন, আমি কি তোমার শত্রু যে তোমার দুরবস্থা দেখব এই আশা করে এসেছি?'

বিষ্ণু কী বলতে যাচ্ছিল। শান্তা বাধা দিয়ে বললে, 'অবশ্য বলতে পার আমি তোমার যা-ক্ষতি করেছি, অতি বড় শত্রুও তা করে না।'

—'সেই এক কথা! বেশ, মানলাম তুমি ক্ষতি করেছ। কিন্তু তোমার বাবা তো ক্ষতিপূরণ করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। এখন আর তোমার মনে দুঃখ থাকা উচিত নয়।'

—'আমার কিছুই বলবার থাকত না যদি তুমি বাবার কথা রাখতে। তাহলে এটুকু অন্ততঃ বুঝতাম যে তুমি আমায় ক্ষমা করেছ।'

—'কিন্তু এও বা মন্দ কী হল? আমি আমার সামান্য চাকরিতে সুখী। তোমরা ভাবছ আমি সুখী নই। একটা কাল্পনিক দেনা চাপিয়ে নিয়েছ নিজেদের ঘাড়ে। আমি বলছি আমার কিছু পাওনা নেই। তোমরা তা মানবে না। কাজেই তোমরা আটকা পড়েছ একটা ঋণের বন্ধনে। এও তো আমার কম লাভ নয়!'

—'অপরাধ যখন করেছি শাস্তি নিতে রাজী আছি। কিন্তু সেই সঙ্গে অপমানটা না হয় নাই করলে।'

বিষ্ণু শাস্তার কথায় সঙ্কুচিত হল। শাস্তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার মনে হল কী যেন দেখতে পেল শাস্তার চোখে যা এতদিন তার চোখে পড়েনি।—শাস্তার চোখে জল। সমুদ্রের ধারে ছিঁচকাদুনে বৃষ্টির পাতলা জল নয়। কালো মেঘের ওপর মেঘ জমে জমে তা থেকে ঝরে পড়া ফোঁটা ফোঁটা ভরাট ভারি জল।

বিষ্ণু শাস্তার মন হালকা করবার চেষ্টায় বললে, 'লজ্জা, মান, ভয়—তিন থাকতে নয়।'

শাস্তা হাসতে গেল, পারল না। বললে, 'যখন তুমি স্পষ্ট বলে দিলে তোমার সাধের চাকরিকেই তুমি চাও, আর কিছু চাও না—দেনাপাওনার বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধনের ভরসা তোমার নেই—আমার লজ্জা-মান আর রাখলে কোথায়? তোমার ঠিকানাটুকুও আমায় দেবার দরকার মনে করনি—তাই 'উত্তরায়ণ'-এ টেলিফোন করে জানতে হল তোমার ঠিকানা। নির্লজ্জের মত এসে উঠতে হল তোমার বাড়িতে।'

নারকোলপিসির কানে মেয়েলী গলার আওয়াজ কিছুক্ষণ আগেই ঢুকেছিল। প্রথমে ভেবেছিলেন পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের কেউ। পরে সন্দেহ হতে কান খাড়া করে শুনলেন বড়দের মত কথা বলছে দুজনে। দোরগোড়া থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস রে বিষ্টু?'

বিষ্ণু হেসে বললে, 'ঘরে ঢুকেই দেখনা, কে এসেছে।'

পিসিমা ঘরের ভেতরে পা দিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'ওমা, এ কাদের মেয়ে?'

শাস্তা এগিয়ে গিয়ে পিসিমাকে প্রণাম করল। বিষ্ণু বলল, 'এর নাম শাস্তা। কার কাছে শুনেছে তুমি খুব ভাল রাঁধতে পার, তাই তোমার কাছে রান্না শিখতে এসেছে।'

—'ও হরি! ভাল লোকের কাছে রান্না শিখতে এসেছ বাছা।

আমি কি আর চপ্‌-কাটলেট কালিয়া-কোর্মা রাঁধতে জানি যে তোমায় শেখাব, আমার রান্না হল শাক-শুক্তো, মোচার ঘণ্ট, থোড়-ছেঁচকি এই সব। বিষ্টু তবু খায় আর কেউ তো আজকাল এসব রান্না মুখে দিতে চায় না। তা—তুমি টেলিফোঁর কথা কী যেন বলছিলে?'

বিষ্ণু বলে উঠল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ। বলছিল আমাদের বাড়িতে একটা টেলিফোন থাকলে বেশ ভাল হত, তাহলে তুমি টেলিফোনেই রান্না শেখাতে পারতে।'

—'রক্ষে কর, অত সুখের দরকার নেই আমার। আমার এক ননদ বিয়ের পর কলকাতায় শ্বশুর ঘর করতে এসে একদিন টেলিফোঁ ধরেই সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। ডাক্তার, বদ্যি, বরফ, ওষুধ, ছুঁচ সবরকম চিকিৎসাই হল, কিন্তু জ্ঞান আর হয়না। শেষকালে মা কালীর খাঁড়া-ধোয়া জল খেয়ে কোন মতে বেঁচে যায় সে যাত্রা। সেই শুনে আমিও নাকে খত দিয়েছি যে এ জন্মে টেলিফোঁ তো কানে লাগাবই না, টেলিফোঁর ছায়া পর্যন্ত মাড়াব না।'

বিষ্ণু আর শান্তা হো হো করে হেসে উঠল।

শান্তা চলে যাবার পর পিসিমা বিষ্ণুকে বললেন, 'হ্যাঁরে, অতবড় মেয়ে একলা একলা রান্না শিখতে এলে লোকে আবার তোর বদনাম করবে না তো?'

বিষ্ণু হেসে বললে, 'লোকে বদনাম করে করুক, তুমি আমায় ত্যাজ্যপুত্তুর না করলেই আমি নিশ্চিন্দি।'

বিষ্ণুর কথায় পিসিমার অশ্রুরোধ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। বিষ্ণুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হিরণ্যকশিপুর মত বাপ না হলে এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে কেউ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়!'

যাই হোক, পিসিমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে শান্তা সত্যিই মাঝে মাঝে আসতে লাগল রান্না শেখার ছুতো করে। কিন্তু গণ্ডগোল বাধল রান্নার যোগাড় আনা নিয়ে। বিষ্ণু যেদিন জানতে পারল যে শান্তা সঙ্গে করে কাঁড়িকাঁড়ি রান্নার আনাজ আর মশলা তো আনেই, তার ওপর কখন কখন মাছ-মাংস, তার রাগটা গিয়ে পড়ল পিসিমার ওপর। পরে একদিন শান্তা আসতেই তার সঙ্গে-আনা ঝুড়িটা নিজেই কাঁধে করে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। শান্তা পিসিমার ঘরে চলে গেল। বিষ্ণু ফিরে এসে বলল, 'ভিখিরীকে দান করে এলুম—পুণ্যি তোমার আদ্ধেক, আমার আদ্ধেক।'

এরপর শান্তা আর কোনদিন কোন যোগাড় আনতে সাহস করেনি।

কিন্তু তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল যেদিন তার সামনে ভগবান স্যাকরা একথালা মিষ্টি আর ফল এনে পিসিমাকে বললে, 'পূজোর পেসাদ—কাজরীদিদি পাঠিয়েছেন।'

পিসিমা নাক সিটকে বললেন, 'ঐ কোণে রেখে দাও বাছা।' ভগবান থালা রেখে চলে গেল।

বিষ্ণু তার ঘরে শান্তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। রান্না শেখা শেষ হলে সে যাবার পথে খানিকটা গল্প করে যাবে। কিন্তু শান্তা আজ বিষ্ণুর দিকে চাইল না পর্যন্ত। গটগট করে ঘরখানা কোনাকুনি পেরিয়ে দরজা খুলে মোটরে গিয়ে উঠল।

শান্তার অভিমানের কারণ বিষ্ণু বুঝেছিল। তবু পিসিমার কাছে গিয়ে পাকা করে নিল। পিসিমা বললেন, 'শান্তামার কোন দোষ নেই। ও দুটো মুলো-বেগুন এনেছে কি না-এনেছে তুই অমনি সাত-তাড়াতাড়ি ছুটলি ভিখিরীকে বিলিয়ে আসতে। মা আমার তাই স্পষ্ট বলে গেল যে তাহলে ঐ থিয়েটারের মেয়েটাই বা যখন তখন ভেট পাঠায় কোন অধিকারে?'

বিষ্ণু বুঝতে পারলনা এই কথাগুলোর কতখানি শান্তার বলা কতখানি পিসিমার বানান। তবে কাজরীর প্রতি পক্ষপাত দোষে সে যে

আজ গুরুতরভাবে অভিযুক্ত তা বুঝিনি বলবার উপায় ছিল না। বিষ্ণু এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিল যে শান্তার মন ঠাণ্ডা হলে আপসের একটা সুযোগ আপনিই জুটে যাবে।

কাজরীর সঙ্গে দেখা হতে বিষ্ণু বললে, 'সেদিন একথালা ফলমিষ্টি পাঠিয়ে আমায় খুব বিপদে ফেলেছেন।' কাজরী ম্লান হাসি হাসল। সে ভগবানের মারফত বিষ্ণুর অনেক খবরই রাখত। শুনেছিল যে শান্তা বলে একটি কলেজে-পড়া মেয়ে প্রায়ই বিষ্ণুবাবুর পিসিমার কাছে রান্না শিখতে আসে এবং তা নিয়ে পাড়ার দু চারজন ঠাট্টা-তামাসাও করে। বিষ্ণুর বিপদ যে তাকেই কেন্দ্র করে কাজরীর পক্ষে তা অনুমান করা কঠিন হল না। সে বললে, 'আমার ফলমিষ্টি পাঠান কি অন্যায় হয়েছে?'

বিষ্ণু হেসে বললে, 'অন্যায় হয়নি, তবে আপত্তি উঠেছে, কারণ আমি নিজেই আপত্তি করেছিলাম এই রকম কোন ব্যাপারে।'

—'তাহলে অন্যায়টা আপনার, আমার নয়। তবু আমার সৌভাগ্য যে আমায় হিংসে করে এমন লোকও পৃথিবীতে আছে।'

—'এটা আপনার বিনয়। আপনি নিশ্চয় জানেন আপনাকে হিংসে করার লোকের অভাব নেই, এবং সেই হিংসেই হল আপনার দামের মাপকাঠি।'

—'আমার দাম? কিসের দাম? হ্যাঁ, হয়ত কিছুটা আছে এই দেহটার। আমার নিজের কোন দাম নেই। যারা এই সামান্য জিনিসটুকু বোঝে না তারাই আমাকে হিংসে করে।' কাজরী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বিষ্ণুকেও তাই খোঁটা দিল এই সুযোগে। বললে, 'এই দেখুন না, আপনার মত ভদ্রলোক আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে পর্যন্ত ঘেন্না করেন। তবু আপনি বলবেন আমার দাম আছে, আমি হিংসের যোগ্য।'

বিষ্ণু লজ্জা পেল। আজ অবধি কাজরীর বাড়িতে সে কোনদিন যায়নি, সত্যি। 'উত্তরায়ণ'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই কাজরীর বাড়িতে কোনও না কোন উপলক্ষে হাজরি দিয়েছে—শুধু বিষ্ণু ছাড়া। হয়ত এইটেই ছিল কাজরীর একটা বড় অভিমান। কিন্তু বিষ্ণু যে কাজরীকে ঘৃণা করে এড়িয়ে গেছে তাও নয়। সে দরকার মনে করেনি জানবার 'উত্তরায়ণ'-এর কাজরী 'উত্তরায়ণ'-এর বাইরে কী ভাবে থাকে, কী ভাবে কথা কয়। অবশ্য, এইটেই নিয়ম যে সমজীবী লোকেরা পরস্পরকে নিয়ে একটা ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে, যাতে সকলে একই সঙ্গে ওঠে, আর নামতে গেলেও তাই। হয়ত সেইজন্যে তারা জানতে চায় পরস্পরের নাড়ীনক্ষত্র যাতে একজন আর একজনকে টেক্কা না দিতে পারে।

বিষ্ণু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারল না। বললে, 'কী কথা থেকে কী কথা উঠল দেখুন। আপনাকে ঠাট্টা করতে গিয়ে আমিই জব্দ হয়ে গেলাম। তবে পায়ের ধুলো দেবার কথা যখন পাড়লেন আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনার বাড়িতে শুধু পায়ের ধুলোই দেবনা, ব্রাহ্মণভোজনের দক্ষিণাটাও আদায় করে আনব একদিন।'

এরপর মাসখানেক কেটে গেছে। শান্তা আর রান্না শিখতে আসেনি। পিসিমা বিষ্ণুকে কয়েকবার বলেছিলেন খোঁজ নিতে, কিন্তু বিষ্ণুও অভিমান করার সমান অধিকার দাবি করল। তবুও পিসিমার পীড়াপীড়িতে সে একটা চিঠি লিখল শান্তাকে—তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে কাজরী তার হিংসের যোগ্য নয়—সে যেন অযথা কাজরার সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা পোষণ না করে।

ইতিমধ্যে নতুন বই 'কলঙ্ক'-এর রিহার্সাল পুরোদমে শুরু হল এবং বিষ্ণু 'উত্তরায়ণ'-এ এই প্রথম নায়কের ভূমিকা পেয়ে সমস্ত সময় আর

উৎসাহ ঢেলে দিল তারই পেছনে। বাড়ি-ঘর, পিসিমা, শান্তা, ছোট বন্ধুদের দল সব মুছে গেল তার মন থেকে।

এগার

ঘুম ভেঙে ক্যালেণ্ডারের তারিখে চোখ পড়তে বিষ্ণু বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। আজ 'কলঙ্ক'-এর উদ্বোধন। বিষ্ণুর জীবনে একটা স্মরণীয় দিন। হঠাৎ তার কী মনে পড়ে গেল। বাক্স খুলে একটা ছোট কাগজের মোড়ক বার করল। তার মধ্যে ছিল তার জীবনের আর একটা স্মরনীয় দিনের নিদর্শন। যেদিন সে জীবনে প্রথম অভিনয় করেছিল—যেদিন ঐ অপরাধে তাকে ঘর ছেড়ে পথে দাঁড়াতে হয়েছিল—সে দিনের সাক্ষী একটা রূপোর মেডেল। অযত্নে কালো ছোপ ধরেছে তার গায়ে। কাপড়ের খুঁট দিয়ে বিষ্ণু সেটাকে ঘষতে লাগল।

এমন সময় দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হতে বিষ্ণু তাড়াতাড়ি মেডেলটা বাক্সয় রেখে উঠে গেল দরজা খুলতে। তার মন বলল শান্তা এসেছে চিঠি পেয়ে। আশা করে বিষ্ণু দরজা খুলল—কিন্তু মুখ শুকিয়ে গেল গোপীকান্তবাবুকে দেখে।

আহ্বানের অপেক্ষা না রেখে গোপীকান্তবাবু ঘরে ঢুকে সামনেই ডমরু হয়ে পড়ে থাকা মোড়াটা সোজা করে গ্যাঁট হয়ে বসলেন। ভাড়ার তাগাদার অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ পাড়বার আগে তিনি পকেট থেকে বার

করলেন একটি প্রমাণাকার পানের ডিবে। তারই এক ধারে ছিল চুন আর দোক্তার দুটো খুপরি। গোপীকান্তবাবু ধীরস্থিরচিত্তে দুটি পান চুনসহযোগে মুখের ভেতর পুরে দিলেন, তারপর ছড়িয়ে দিলেন এক টিপ দোক্তা, সম্বরা দেবার মত। এই রকম অকারণ দেরি করে প্রতিদ্বন্দ্বীর স্নায়ুশক্তি পরীক্ষা করাকে স্নায়ুযুদ্ধ বলা হয়। গোপীকান্তবাবুর হয়ত তা জানা ছিল, কিংবা তিনি চাইছিলেন যে কথাটা বিষ্ণুই পাড়ুক। বিষ্ণুর বলতে কোন বাধা ছিল না যে সে গোপীকান্তবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ শুধু এই জন্যে যে তিনি পাঁচ মাস অপেক্ষা করেছেন, এমনকি ভগবান স্যাকরাকে পর্যন্ত কোন কথা জানাননি বিষ্ণুর অনুরোধে। বিষ্ণু বিনয়ের সঙ্গে বলল তাকে আর একমাস সময় দিতে।—এর মধ্যে সে নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করে উঠতে পারবে।

গোপীকান্তবাবু নিজের আঙুলগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললেন, 'কেন, লটারির টিকিট কেটেছেন ?'

—'না—না। মানে, আমি যেখানে চাকরি করি, অর্থাৎ 'উত্তরায়ণ' থিয়েটার, সেখানে আজ একটা নতুন বই শুরু হচ্ছে আর আমিই করছি হিরোর পার্ট। এতদিনে ভাগ্যদেবী একটু মুখ তুলে চেয়েছেন। আশাকরি আমার মাইনেও এই সঙ্গে বেড়ে যাবে।'

—'তাহলে তো কোন কথাই নেই। তেঁতুলবিচি তো পোঁতা হয়েই গেছে, এবার তেঁতুল বিক্রির টাকাটা আমি খরচ করতে পারি, কী বলুন ?'

—'আপনি হয়ত আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিন্তু আমি একটা কথাও মিথ্যে বলিনি। তাছাড়া আমার কিছু বোনাসও পাওনা হয়েছে। সেই টাকাটা আজকালের মধ্যেই পেয়ে যেতে পারি—পেলেই আপনার বাড়িভাড়া যতটা পারি শোধ করে দেব।'

গোপীকান্তবাবু নরম হলেন না। বললেন, 'শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। আপনার ভাড়া বাকী পড়েছে পাঁচ মাসের—যার নাম দেড় শ টাকা। এতদিন তাও কিছু বলিনি কারণ আমার ধারণা ছিল

আপনি ভদ্রলোক—মোটরে চড়ে এলেন—ভগবান স্যাকরা আপনার জামিন হল—আমি নির্ভাবনায় ছিলুম যে আপনার কাছে পাওনা টাকা মারা যাবে না। কিন্তু এখন দেখছি আপনার চালচলন মোটেই ভাল নয়। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোর মাথা খাচ্ছেন তা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি—সময় নেই অসময় নেই তারা এসে আপনার বাড়িতে দিব্যি আড্ডা মারছে, পড়াশুনো যা হচ্ছে মা ভগাই জানেন। তার ওপর আমার গিন্নী বলছিলেন যে ইদানীং আপনার বাড়িতে নাকি অবিবাহিতা মেয়েছেলেকেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই সব দেখে শুনে আমি আজ ভগবান স্যাকরাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম—সোজা কথা বলি আপনাকে—।'

বিষ্ণু বাধা দিল।—'এটা আপনি না করলেও পারতেন। ও বেচারীর কী দোষ? ভালমানুষ বলে আমাকে বাড়িটা পাইয়ে দেবার জন্যে বলে ফেলেছিল জামিন হবে। তা বলে কি সত্যি সত্যি আপনি ওর কাছ থেকে টাকা নেবেন, না আমিই আপনাকে নিতে দোব?'

—'ও সব থিয়েটারি ঢং রাখুন। ভগবান স্যাকরাকে বলেছি যে আজ সন্ধ্যের মধ্যে টাকা না পেলে আপনার বাড়ির দরজায় তালাচাবি পড়ে যাবে। তারপর আপনি ইচ্ছে করলে ভগবান স্যাকরার অতিথি হতে পারেন যতদিন না ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ফিরে আসবার মত অবস্থা হয়।'

—'আপনার যা ইচ্ছে হয় করবেন কিন্তু আমার দিব্যি রইল, আপনি ভগবান স্যাকরার হাত থেকে একটা পয়সা নিতে পাবেন না।'

—'বেশ তো! আপনি নিজের হাতেই বাকী ভাড়াটা সন্ধ্যের আগে দিয়ে দেবেন, নয়ত জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাবেন। এ দুটোর একটা নিশ্চয় পারবেন। কী বলুন?—হেঁঃ—হেঁঃ।'

কষের নীচে গড়ান পানের দাগ মুছতে মুছতে গোপীকান্তবাবু চলে গেলেন।

পিসিমা দরজার আড়াল থেকে সব কথা শুনে ভয়ে কাঁপছিলেন।

বাড়িওলা চলে যেতে ঘরে ঢুকে বললেন, 'এ আবার কী অনাসৃষ্টির কথা ? হুট বলতে লোকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে নাকি ?'

বিষ্ণু গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি ভেবনা—একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

বার

অভিনয়ের দিন দিবানিদ্রা যে বিধেয় এ কথা কাজরীই বিষ্ণুকে বলেছিল। আজ কিন্তু শত চেষ্টা করেও বিষ্ণুর ঘুম আসছিল না। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠি উঠি করে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে কে জানে! আর এমন ঘুমিয়েছে যে ওঠবার পর চোখেমুখে জল দেবারও সময় রইল না। কোনরকমে জামাজুতো গলিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বিষ্ণু যখন 'উত্তরায়ণ'-এ গিয়ে পৌঁছল তখন অভিনয় আরম্ভ হতে মাত্র মিনিট কুড়ি দেরি।

পেছনের দরজা দিয়ে বিষ্ণু একরকম চুপি চুপি গিয়ে ঢুকল সাজঘরে। পাঞ্জাবিটা খুলতে খুলতে বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে দাও হে অবনী। বড়কর্তার চোখে পড়লে আর রক্ষে নেই।' পেণ্টার অবনী ঘরের কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। ঐ কোণটা ওর নিজস্ব—দেয়ালের ছোপটা ওর পিঠের। কাজের আগে মৌজ তার চাই। দুটো শেষটান দিয়ে বিড়িটা মাটিতে ফেলে উঠে গেল দরজাটা ভেজিয়ে দিতে। বিষ্ণু ততক্ষণ আয়নার সামনে চেয়ারে বসে পড়েছে।

বললে, 'নাও হে অবনী, একটু তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে আমায় ছেড়ে দাও—বড্ড দেরি হয়ে গেছে।' ঘড়ির দিকে চেয়ে বললে, 'ইশ—মোটে পনের মিনিট।'

অবনী গোলা রং দু হাতের চেটোয় মাখাতে মাখাতে দাঁত বার করে হাসল। আয়নায় বিষ্ণুর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না—ঠিক টাইমে তুলে দেব। আমার বাবা পেণ্টার, আমার ভগ্নীপতি পেণ্টার, আমার মেসো পেণ্টার, আমার চোদ্দপুরুষ পেণ্টার। শুধু চাপড় আর পোঁছ মারতে যা দেরি।'

—'বুঝলুম, কিন্তু বড়কর্তা যদি টের পান যে আমার এখনও সাজ হয়নি তাহলে—।'

—'তা তিনি টের পেয়ে গেছেন। একটু আগেই যে এসেছিলেন আপনার খোঁজ নিতে!'

বিষ্ণুর বুকটা ধড়াস করে উঠল। —'বল কী? তুমি কী বললে?'

—'আমি বললুম, এতক্ষণ স্টেজের ওপর বসে আছেন, দেখুন গিয়ে।'

বিষ্ণু দম ফেলে বাঁচল। হেসে বললে, 'জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা বলে দিলে?'

—'তা বলব নাতো কী? উনিও ড্যাম গ্ল্যাড, আর আপনিও ড্যাম গ্ল্যাড। এখন চারগণ্ডা পয়সা দিন দিকি। মাইরি বলছি, বিকেল থেকে এক ফোঁটা চা পেটে পড়েনি।'

—'চা খাবে তো চারগণ্ডা পয়সা কেন?'

—'তার মানেই হল চার পয়সা। কিন্তু লোকের কাছে চাইতে গেলে চারগণ্ডা বলতে হয়, নইলে ভাববে ভিখিরী।'

বিষ্ণু হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা সিকি বার করে অবনীর হাতে দিল।

অবনী কথা রাখল। সময় মত পেণ্ট শেষ করে দিয়ে প্রথম দৃশ্যের জামা কাপড়গুলো বেছে দিতে লাগল।

বিষ্ণু জিজ্ঞেস করল—'কী রকম টিকিট বিক্রি হয়েছে জান ?'

—'শুনছি তো হাউস ফুল।'

—'বড়কর্তা তাহলে বেশ খোশমেজাজে আছেন বল।'

—'আজ্ঞে তাই ছিলেন। তবে কিছুক্ষণ আগে মামাভাগ্নেতে একটু চটাচটি হয়ে গেছে।'

বিষ্ণু বললে, 'মাত্রাটা বোধ হয় একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল ?'

—'তা আর বলতে ? যেমন মামা, তেমনি ভাগ্নে। তবে দোষটা দুলালবাবুরই। কাজরীদেবী নিজের ঘরে ড্রেস করছিলেন দুলালবাবু বুঝি সেইখানে বসে ঠাট্টামস্করা করছিলেন। বড়কর্তা তাই দেখে তো একেবারে ফায়ার। সবাকার সামনে নিলেন দুলালবাবুকে এক হাত। আর দুলালবাবুও নেশার ঝোঁকে বড়কর্তাকে যা মুখে এলো তাই বলে দিলেন।'

ঘটনাটা শুনে বিষ্ণু একটু দমে গেল। বললে, 'আজকের দিনে এ রকম চটাচটি না হলেই ভাল ছিল।'

এমন সময় কার্তিকবাবু দরজা ঠেলে মুখ বাড়িয়ে প্রায় আঁতকে উঠলেন, 'এ্যাঁ ? এখনও হয়নি ?'

অবনী এক গাল হেসে মিষ্টি করে বলল, 'সব কমপ্লিট্—আপনি ড্রপ তুলতে বলুন না।'

কিছুক্ষণের মধ্যে অভিনয় শুরু হয়ে গেল। বিষ্ণু আর কাজরী দুজনেই তাদের সুদক্ষ অভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহকে মুগ্ধ করেছে প্রথম অঙ্কের শেষেই তা বোঝা গেল। বিষ্ণু হাসতে হাসতে যখন সাজঘরে ফিরে এল দর্শকদের হাততালি তখনও থামেনি।

অবনীকে দেখে বিষ্ণু হেসে বললে, 'আশা আছে হে অবনী !'

—'কিসের আশা ?'

—'বোনাসের।'

—'দুত্তোর ! ক্ষেপেছেন আপনি ?'

—'কেন ?'

—'আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন ? এই ছ মাস ধরে রোজই শুনছি বোনাস পাওয়া যাবে। আমি শেষকালে হাল ছেড়ে দিয়ে পরশুদিন বোনাসের টাকাটা বৌকে উইল করে দিলুম। আমি মলে যদি ও আদায় করতে পারে।'

—'তুমি খামকাই মাথা গরম করে ফেললে। আসল খবরটা শোনো আগে। বড়কর্তা আজ প্লে দেখে এত খুশি হয়েছেন যে বলে দিয়েছেন 'পতঙ্গ'-এর বোনাসটা আজ রাত্তিরেই পেমেণ্ট হবে। তার ওপর 'কলঙ্ক'-এর জন্যে আরও একটা বোনাস দেবেন কিছুদিন পরেই।'

অবনী এবার আর বিষ্ণুর কথা অবিশ্বাস করতে পারল না। আনন্দে তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। দাঁত বার করে বললে, 'এ কথা আগে বলেন নি ঠাকুর ! দাঁড়ান আপনাকে আর এক পোঁছ রং লাগিয়ে দিই।'

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে বিষ্ণু যখন ফিরে এল, তার মুখের ভাব দেখে অবনী চুপসে গেল। গলা খাটো করে বললে, 'কী হল বিষ্টুবাবু ? আশা নেই ?'

বিষ্ণু বিরক্ত হয়ে জামাকাপড়গুলো খুলে চারিদিকে ছড়াচ্ছিল। অবনীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'শুনেছ কোথাও যে মাতালের পার্ট করবার জন্যে কেউ সত্যি সত্যি চুর হয়ে স্টেজে নামে ?'

—'তাই নাকি ?'

—'ঐ হতভাগা বিপিন। এই অঙ্কে লোকে বুঝতে না পেরে খুব হাততালি দিল কিন্তু ওর এমন অবস্থা যে পরের সীনে ওর দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকবে না। কী যে হবে ভগবানই জানেন।'

অবনী কিন্তু ভয়ের কোন কারণ দেখতে পেল না। বরঞ্চ উৎসাহিত হয়ে বললে, 'তাহলে বিপিনের রগড়টা আমায় একবার দেখে আসতে হয়।' বলে বিষ্ণুকে তাড়াতাড়ি সাজিয়ে দিয়ে সে বাইরে চলে গেল।

দুলাল বিপিনকে মদ খাইয়ে মাতাল করেছে জানতে পেরে কার্তিকবাবু দুলালের ওপর রেগে টং হয়েছিলেন। কিন্তু এদিকে সব মাটি হয়ে যায় দেখে বিপিনের মাতলামি ছাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। বিপিনকে এখন আর বাদ দেওয়া চলে না—বদলানও মুস্কিল। দর্শক তাহলে ক্ষেপে যাবে। কার্তিকবাবু রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন!

কিছুতেই কিছু করা গেল না। বিপিনের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যেতে লাগল। অগত্যা কার্তিকবাবু বিপিনের পার্ট কেটে দিয়ে ব্যবস্থা করলেন যে সে একবার শুধু ষ্টেজে গিয়ে দাঁড়াবে, তারপর 'ঐ-যে, ঐ-যে' বলে দুজন লোক ছুটে গিয়ে জোর করে তাকে ষ্টেজ থেকে টেনে নিয়ে আসবে।

বিপিনকে দুজনে শক্ত করে ধরে ষ্টেজে দাঁড় করাল। আর ড্রপ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা সরে গেল। কিন্তু বিপিনের তখন এমন অবস্থা যে এক মিনিটও ষ্টেজে দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। তাকে টেনে আনবার লোক পোঁছবার আগেই সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল ষ্টেজের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের যবনিকা নামিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু জানা গেল তার আগেই বিপিনের জীবনে যবনিকা পড়ে গেছে।

তের

বিপিনের মৃত্যুসংবাদটা চাপা দেবার জন্যে কার্তিকবাবু অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। দর্শক ও ফালতু জনতার ভীড় ক্রমশঃ

চাপ দিতে লাগল ভেতরে যাবার দরজাগুলোর ওপর। ইতিমধ্যে ডাক্তার ও পুলিশ-ভ্যান এসে হাজির হল। কার্তিকবাবু বাধ্য হয়ে জানিয়ে দিলেন যে 'কলঙ্ক'-এর বাকী দুটি দৃশ্য সেদিন আর অভিনয় করা সম্ভব হবে না। ঘোষণা শুনে দর্শকদের মধ্যে একদল বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, অপর দল কৌতূহলী হয়ে আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। এঁরা খাস সংবাদদাতা। কাগজে ছাপা হবার অনেক আগে এঁদের মুখ দিয়ে বিপিনের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে যাবে ট্রামে-বাসে, অলিতে-গলিতে।

বিষ্ণু ভাবল এ রকম পরিস্থিতিতে 'উত্তরায়ণ' থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়াই বাঞ্ছনীয়। বোনাস মাথায় থাক। কিন্তু পুলিশ তারও একটা জবানবন্দী না নিয়ে ছাড়ল না। আনন্দ নিয়োগী লেনে পৌঁছতে পৌঁছতে আদ্ধেক রাত পার হয়ে গেল।

বাড়ির দরজায় তালা! বিষ্ণুর রক্ত মাথায় চড়ে গেল। সে ধারণাই করতে পারেনি যে গোপীকান্তবাবু বলে কয়ে এতবড় দুষ্কর্মটা করবেন। আর নারকোলপিসি? তিনি কি অপমানিত হয়ে তাঁর ভাশুরপোর দজ্জাল বৌয়ের হাতে আত্মসমর্পণ করতে গেলেন? অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিষ্ণু চেয়ে রইল তালাবন্ধ বাড়ির দিকে। কী তার অপরাধ যার জন্যে ভাগ্য তাকে বাড়ি ছাড়া করে বারে বারে পথের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? বিষ্ণু দাঁতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট দুটো টিপল। দুষ্ট বরাতকে শায়েস্তা করার উপায় হল তার অভিশাপকে আশীর্বাদ বলে মেনে নেওয়া। তাহলে কি সে পথকেই আশ্রয় করবে, যাতে আর কোনদিন তাকে ঘরছাড়া না হতে হয়?

এমন সময় কাছাকাছি খুট করে একটা আওয়াজ হল। বিষ্ণু বাড়ির দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল একটি ছোট ছেলে খিড়কি দরজা খুলে চুপি চুপি বেরিয়ে এল। বিষ্ণু তাড়াতাড়ি

এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির হাত ধরে বললে, 'বাদল ? এত রাত্তিরে কী করছিস ?'

বাদল ফিসফিস করে বলল, 'ভণ্টুর বাবা আপনার বাড়িতে তালাচাবি লাগিয়ে দিয়েছেন, যাতে আপনি না ঢুকতে পারেন। আমি পাঁচিল টপকে খিড়কি দরজা খুলে রেখেছি—আপনি ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিন।'

বিষ্ণু বাদলের মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'খুব অন্যায় করেছ, বাদল। তোমার মা-বাবাকে না জানিয়ে এত রাত্রে একলা একলা রাস্তায় বেরনো তোমার উচিত হয়নি। জান তো ? চোরডাকাত শুধু টাকাকড়ি জিনিসপত্তর নিয়েই পালায় না, তোমাদের মত ছোটখাট হীরের টুকরো নিয়ে পালাতে পারলেও তারা ছাড়ে না।'

বাদল মুখ কাঁচুমাচু করে চলে যাচ্ছিল। বিষ্ণু বললে, 'ভয় নেই, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। যদি ফেরবার সময় কেউ দেখে ফেলেন আমার নাম কোরো বা আমায় চেঁচিয়ে ডেকো, আমি গিয়ে বুঝিয়ে আসব।'

বাদল এগিয়ে যেতে যেতে বাঁয়ে সরে পাঁচিলের পাশ দিয়ে খানিকটা গিয়ে একবার দাঁড়াল। কয়েকবার চেষ্টা করে কিসের ওপর যেন উঠে পড়ল, তারপর চড়ল পাঁচিলের ওপর—সেখান থেকে পেয়ারা গাছে—সেখান থেকে দোতলার বারান্দায়। বিষ্ণু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ডাকাত !'

হঠাৎ বিষ্ণু আবিষ্কার করল, বাদল যে-বস্তুটির ওপর উঠে পাঁচিলে চড়ল তার চলৎশক্তি আছে। বস্তুটি পাঁচিলের গা ঘেঁষে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে রাস্তা দিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুটে নিমেষের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। গ্যাসের আলোয় বিষ্ণু এক ফাঁকে চিনে ফেলল তাকে—গোপীকান্তবাবুর ছেলে ভণ্টু! এও কি সম্ভব ? অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় বিষ্ণুর মন ভরে উঠল। শুধু গোপীকান্তবাবুর সব দোষই সে খণ্ডায়নি, বিষ্ণুর নিজের দোষও সে যেন দেখিয়ে

দিয়েছে চোখে আঙ্গুল দিয়ে। বিষ্ণু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

ভেবে ভেবে বিষ্ণু শেষকালে এই স্থির করল যে গোপীকান্তবাবুর পাওনা দেড় শ টাকা সে যেমন করে হোক যোগাড় করে আগে বাদল আর ভণ্টুর মান বাঁচাবে। তারপর পিসিমাকে নিয়ে আসবে বাড়ির তালা খুলিয়ে। এ ছাড়া সব দিক রক্ষা হয়না।

সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু রওনা হল টাকার সন্ধানে। কার্তিকবাবু বা দুলাল কাউকে না কাউকে সে পাবেই 'উত্তরায়ণ'-এ। বিপিনের ঝামেলা নিশ্চয় মেটেনি এখনও।

খানিকটা হেঁটে, খানিকটা গ্যারেজ-ফিরতি বাসে, বিষ্ণু 'উত্তরারণ'-এ গিয়ে পৌঁছল। বাইরেটা খাঁ খাঁ করছে—একটা আলো জ্বলছে সদর দরজার মাথায়। দরজা খোলা পেয়ে বিষ্ণু ঢুকে পড়ল ভেতরে—চলে গেল প্রেক্ষাগৃহে। অন্ধকার জনহীন প্রেক্ষাগৃহের সামনে রঙ্গমঞ্চের যবনিকা তোলা—বিপিনের মৃতদেহ তখনও পড়ে আছে—অদূরে একজন পুলিশ কনেস্টবল বসে বসে ঢুলছে লাঠির ওপর ভর দিয়ে। সারি সারি চেয়ার হেলান দিয়ে দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখছে ঐ দৃশ্য।

কনেস্টবলকে জিজ্ঞেস করে বিষ্ণু জানতে পারল যে কার্তিকবাবু দুলালের সঙ্গে থানায় গেছেন ঘণ্টা খানেক আগে—কখন ফিরবেন ঠিক নেই। বিষ্ণুর গা শিরশির করে উঠল। এখানে বসে থাকার চেয়ে বাইরে দাঁড়ান ভাল। বিষ্ণু 'উত্তরায়ণ'-এর বাইরে গিয়ে ফুটপাথে দাঁড়াল।

বসন্ত তখনও ফোটেনি। বাতাসে অল্প অল্প কাঁটা লেগে রয়েছে। রাস্তার বড় বড় আলোর চারপাশে পাতলা জাল। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার। যতদূর চোখ যায় কোথাও দৃষ্টির বাধা নেই, বাধার দৃষ্টি নেই। হঠাৎ বিষ্ণুর মনে হতে লাগল রাত যেন বাষ্প হয়ে তার শরীরের ভেতর প্রবেশ করছে, প্রতি রন্ধ্র দিয়ে, প্রতি লোমকূপ দিয়ে। বিষ্ণু চমকে উঠল। তার মধ্যে এক থেকে দুই হল। আবার দুই থেকে এক। রাত আর আমি মিশে গেল শিরায় শিরায়। বিষ্ণু অবাক হয়ে ভাবতে

লাগল—এই কি সেই রাত যার জন্যে সে এতকাল অপেক্ষা করেছে ? যে রাত শুধু একটি রাত্রি হয়ে জন্মায়—যার অতীত থাকে না ভবিষ্যৎ থাকে না ?

বিষ্ণুর খেয়াল হয়নি যে ইতিমধ্যে সে চলতে শুরু করেছিল। চাকা-লাগান কাঠের খেলনার মত সে চলছিল। তার লঘু দেহ বাতাসের ঠেলাতেই যে-দিকে সে-দিকে চলে যেতে পারত। নাকে দড়ি দিয়ে কেউ টেনে নিয়ে গেলে সে তো একেবারেই অসহায়।

কাজরীর বাড়ির সামনে এসে বিষ্ণু পকেট থেকে নোট-বই বার করে ঠিকানাটা ভাল করে মিলিয়ে নিল। তারপর খোলা দরজার সামনে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল। ভেতরে কোন একটা ঘরে আলো জ্বলছিল—বাইরের দরজার মাথা দিয়ে তার খানিকটা রেশ এসে পড়েছিল সিঁড়ির চাতালে। বিষ্ণু একটা কলিং-বেল দেখতে পেয়ে বেঁচে গেল। ইতস্ততঃ করে সে কলিং-বেলটা সামান্য টিপতেই ঝনঝন করে উঠল আওয়াজ—বিষ্ণুর হাত কেঁপে গিয়েছিল, নইলে অত আওয়াজ হবার কথা নয়। সঙ্গে সঙ্গে দরজার ওপাশ থেকে কাজরীর চাপা গলা শোনা গেল—'কে ?'

—'আমি।' বিষ্ণু গম্ভীর হয়ে সাড়া দিল।

মুহূর্তের মধ্যে কাজরী দরজা খুলে দিল। গলা চিনতে তার এতটুকু দেরি হয়নি, এতটুকু সন্দেহ হয়নি। বিষ্ণুর দিকে ফ্যালফ্যাল করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, 'আপনি ? এত রাত্রে ?'

বিষ্ণু কোন কথা না বলে কাজরীর পাশ কাটিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে তীব্র চোখ-ঝলসানো আলো। মনে হল অন্ধকারকে বিষ্ণু ভয় পেয়েছিল।

কাজরী দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে ঢুকতে বিষ্ণুর চোখের সামনে যেন আর একটা তীব্রতর আলো ঝলমল করে উঠল। 'কলঙ্ক'-এর অসমাপ্ত দৃশ্যে কাজরী যে জামাকাপড় পরেছিল এখনও তা ছাড়েনি। জংলা

বেনারসী—গা ভরা গয়না—এমন কি চন্দনের ফোঁটাও লেগে আছে তার কপালে আর কপোলে!

বিষ্ণু চোখ ফেরাতে দেরি করল। কাজরী ক্ষমা করল না। বললে, 'এতদিন আমার ধারণা ছিল আপনি ব্রহ্মচারী।'

বিষ্ণু লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হল না। তার অনভ্যস্ত চোখ আদেখলের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল—দেয়ালে বড় বড় আয়না, অর্ধনগ্ন নারীচিত্র, মেঝেয় মোটা-গদি-পাতা ফরাশ। বিষ্ণুর নজরে পড়ল এক কোণে টেবিলের ওপর অযত্নে ছড়ান কয়েকটা নোট। বললে, 'তোমার কাছে অর্থ কি এতই নিরর্থক?'

বিষ্ণুর মুখে 'তুমি' সম্বোধন শুনে কাজরী ফোঁস করে উঠল। বললে, 'আমাকে 'আপনি'ই বলবেন। আমায় ঘৃণা করে 'তুমি' বলার লোক অনেক আছে।'

বিষ্ণু বললে, 'তুমি যদি ঘৃণ্য হও, আমিই বা কম ঘৃণ্য কিসে? আমাকেও তুমি 'তুমি' বলতে পার।'

কাজরী এবার হাসল। মনে হল সে খুব খুশি হয়েছে বিষ্ণুকে 'তুমি' বলার অনুমতি পেয়ে। বললে, 'বেশ, কী বলছিলে? টাকা আমার কাছে মাটি কিনা? সত্যি কথা বললে, বলতে হয় 'হ্যাঁ'। যার সংসার নেই টাকার মহিমা সে বুঝবে কেমন করে বল?'

—'আমারই কি সংসার আছে?'

—'না থাকলে টাকার মহিমা তুমিও বোঝনা নিশ্চয়।'

—'কিন্তু আমি না বুঝলেও আর পাঁচজনে বোঝে—তাদের কৈফিয়ত দেওয়াই মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়।'

কাজরী গম্ভীর হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল বিষ্ণু এত রাত্রে তার বাড়িতে এসেছে ঐ একই কারণে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ শুকিয়ে গেল। কতরাত্রে এমন করে টাকা নিয়ে গেছে দুলাল আরও অনেকে। এই কি তার কাজ? গভীর রাত্রে যখন কোথাও টাকা পাওয়া যায় না, সেই সময় টাকা যুগিয়ে লোকের উপকার করবে বলে কি

তার জেগে থাকা ? আর বিষ্ণুও কি ঐ আশা করে এসেছে—যে কাজরী জেগে থাকবে এবং তার কাছে চাইলেই যত টাকা ইচ্ছে সে পাবে ?

বিষ্ণু দেখল কাজরীর মুখ থমথম করছে, কিন্তু বুঝতে পারল না তার হঠাৎ কী হল। সরলভাবে বললে, 'একটা মহা বিপদে পড়ে তোমার কাছে এলাম।'

—'যিনি তোমায় বিপদে ফেলেছেন তাঁকে ধন্যবাদ। তা না হলে তো আর তোমার পায়ের ধুলো পড়ত না।'

—'ধন্যবাদ দিতে চাও দাও, কিন্তু আজ আমায় উচিত শিক্ষা দিয়েছেন তিনি—আমার বাড়িওলা—দরজায় তালাচাবি লাগিয়ে দিয়েছেন।'

কাজরী শিউরে উঠল। তার সব মান অভিমান এক মুহূর্তে জল হয়ে গেল। বাড়ি ভাড়া না দিতে পারার জন্যে বিষ্ণু নিরাশ্রয় ? এই রাতে মাথা গোঁজবার কোন স্থান নেই তার ? মনে মনে আহত হল কাজরী। একটু আগে দুলালের সঙ্গে তুলনা করেছিল বিষ্ণুকে। ছি-ছি।

কাজরী লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কত টাকা বাকী ?'

—'বেশী নয় দেড় শ—পাঁচ মাসের ভাড়া। ভেবেছিলুম 'পতঙ্গ'-এর বোনাসটা এর মধ্যে পেয়ে যাব—খানিকটা শোধ হয়ে যাবে। আজকেও বোনাসটা পাবার খুব সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু দেখলে তো আমার ভাগ্যখানা।'

—'বড়কর্তা জানেন সব কথা ?'

—'না। তবে একটু আগে উত্তরায়ণ'-এ গিয়েছিলাম। আশা করেছিলাম কার্তিকবাবু নয়ত দুলাল একজনের কাছে টাকাটা পেয়ে যাব। কারুর দেখা পেলাম না তাই চলে এলাম তোমার কাছে। জানিনা ভাল করেছি কি মন্দ করেছি।'

—'এ আমার বরাত। ওঁদের কারুর সঙ্গে দেখা হলে তুমি তো আর আসতে না এখানে—আর আমার দক্ষিণা দেওয়াও হত না।'

—'ভোলনি দেখছি।'

—'কোন কথাই ভুলিনি।' কাজরী হাসল।—'বোসো আমি আসছি।' বলে ঘর থেকে চলে গেল।

বিষ্ণু ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল। কাজরীর দেরি দেখে পাশের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

এমন সময় কাজরী ফিরে এল। বিষ্ণুকে দেখতে না পেয়ে তাড়াতাড়ি খাবারের থালা আর জলের গেলাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে ছুটে গেল বাইরের দরজার দিকে। না—দরজা তো বন্ধই আছে। আটকে যাওয়া নিঃশ্বাসটা ছেড়েও তার বুকটা ধুকধুক করতে লাগল।

ঘরে ঢুকে কাজরী বুঝতে পারল বিষ্ণু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। কী বোকা সে! ঘর থেকেই তো বোঝা যায় বিষ্ণু আছে। ঘরে না হোক আশপাশে কোথাও আছে।

নিজের কাছে ধরা পড়ে কাজরীর লজ্জা হল। ভাগ্যিস বিষ্ণুর কাছে ধরা পড়েনি!—তবু প্রমাণ করা দরকার যে সে জানে বিষ্ণু বাড়িতেই আছে—পাশের বারান্দায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। তাই বিষ্ণু শুনতে পায় এমন স্বরে বলল, 'কই? আলো থেকে আবার অন্ধকারে যাবার শখ হল কেন?'

আলো থেকে অন্ধকার? বিষ্ণু চমকে উঠল। সত্যিই কি তার আলো থেকে অন্ধকারে যাবার শখ হয়েছে? তাই কি সে টাকা ধার করবার ছুতো করে কাজরীর বাড়ি ছুটে এসেছে এত রাতে? বিষ্ণুর সন্দেহ হল নিজেকে। লালাবাবুর 'বেলা যায়' শোনার মত সে বিবেকের কান দিয়ে কাজরীর কথাটা শোনেনি তো?

বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকতে গিয়ে বিষ্ণু অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে গেল কাজরীকে দেখে। লাল পেড়ে সাড়ি, এলো করা ভিজে চুল, কপালে সিঁদুর দিয়ে সূর্য আঁকা। এ তো অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবার বেশ!

বিষ্ণু চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়েই রইল। কাজরী অস্বস্তিবোধ করছিল। বললে, 'হাত ধুয়ে খেয়ে নাও!'

বিষ্ণু তবুও দাঁড়িয়ে রইল। কাজরীর মনে হল বিষ্ণুর চোখ যেন কথা বলছে। আঁচলে দেড় শ টাকা গেরো বাঁধা ছিল। তবু কাজরীকে বলতে হল, 'তোমার টাকাটা নিয়ে আসি।' বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিষ্ণু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল কাজরীর রকমসকম দেখে। যে কাজরীকে অনায়াসে কালনাগিনীর সঙ্গে তুলনা করা চলে তার খোলসের মধ্যে যে আর এক অসূর্যম্পশ্যা কাজরী থাকতে পারে এ এক অভিনব সম্ভাবনা। বিষ্ণু বুঝতে পারছিল না কোনটা সত্যি।

হাসিমুখে দু-পা এগিয়ে বিষ্ণু জলের গেলাসটা টেবিল থেকে তুলে নিল। বারান্দা থেকে হাত ধুয়ে এসে, গেলাস রেখে, খাবারের রেকাবটা হাতে নিয়ে আহারে মন দিল। খিদে তার প্রচণ্ডই পেয়েছিল। মুখরোচক মিষ্টান্নগুলোর তাই এক কণাও সে ফেলে রাখতে পারল না পিঁপড়েদের জন্যে।

কাজরী ফিরে এসে দেখল রেকাবটা একেবারে খালি। তার সন্দেহ হল—বিষ্ণু বারান্দা থেকে রাস্তায় ফেলে দেয়নি তো খাবারগুলো? জিজ্ঞেস করতে গিয়ে তার গলা কেঁপে উঠল—'সব খেয়েছ, না?'

বিষ্ণু হেসে বলল, 'খাঁটি বামুন কখনও পাতে মিষ্টি ফেলে রাখে না। পরীক্ষা করতে চাও তো আর এক থালা এনে দেখতে পার।'

—'আজ আর পারব না।' বলে কাজরী হেসে উঠল। তারপর আঁচলের গেরো খুলে দেড় শ টাকার একটা কুণ্ডলী বিষ্ণুর হাতে দিয়ে বলল, 'ব্রাহ্মণকে পেটভরে খেতে দিতে পারলুম না বলে দক্ষিণা নিতে আপত্তি হবে না নিশ্চয়।'

—'আপত্তি হত না যদি না টাকাটা আগেই ধার করে ফেলতাম। তোমার কাছে দক্ষিণা নিয়ে যদি তোমারই ঋণ শোধ করতে বল তোমার পুণ্য দুগুণ হবে ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে আমার ঋণও দুগুণ হয়ে যাবে।'

কাজরী মুখ ভার করে বললে, 'বেশ, সুদশুদ্ধু ধার শোধ করে দিও—তাহলে আর মনে রাখার দরকার হবে না।'

বিষ্ণু চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

চোদ্দ

রাস্তায় বেরিয়ে বিষ্ণুর গা ছমছম করতে লাগল। জনমানব নেই, তবু তার মনে হতে লাগল যেন সহস্রদৃষ্টি তাকে দেখেছে শেষরাতে কাজরীর বাড়ি থেকে বেরতে—তার সঙ্গ নিয়েছে ব্যঙ্গ করার জন্যে।

মোড় ঘুরতে এক রিকশাওলা ঠুং করে ঘণ্টা বাজিয়ে সাড়া দিল। সে জেগে আছে। সারারাত সে জেগে থাকে, সারাদিন ঘুমোয়। বিষ্ণু উঠল না তার রিকশায়। বোঝাতে চাইল যে সে নিশাচর সওয়ারী নয়। পাশ কাটিয়ে হনহন করে হেঁটে চলল বড় রাস্তার দিকে।

আর একটা মোড় ঘুরতে পূবের আকাশ চোখে পড়ল। বিষ্ণুর মনে খানিকটা ভরসা হল। অন্ধকার গলতে শুরু করেছে—রং উঠে যাচ্ছে আকাশের কানা থেকে। বরফগলা পাহাড়ের মত দেখাচ্ছে প্রকাণ্ড আকাশটা।

এখন তো আর রাত নেই। কত লোকই তো এখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বে।

বড় রাস্তায় পৌঁছেও কিন্তু ভোর হল না। রাস্তার আলোগুলো জ্বলজ্বল করছে। ফুটপাথে মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে সার সার নাগরিক।

ফুটপাথ ধরে চলা গেল না। বিষ্ণু ফাঁকা রাস্তার মাঝখান দিয়েই হাঁটতে লাগল। দীর্ঘ প্রাতঃভ্রমণের পর তার কানে এল ট্রামগাড়ির আওয়াজ।

সম্ভবতঃ প্রথম ট্রাম। তার প্রথম যাত্রীই সে হল। দেখেশুনে একটা জানলা বেছে নিয়ে বসে পড়ল হাত-পা ছড়িয়ে। পক্ষীরাজের মত উড়ে চলল ট্রামের বৈদ্যুতিক ঘোড়া।

বাড়ি না গিয়ে বিষ্ণু আগে নারকোলপিসিকে উদ্ধার করবার জন্যে তাঁর ভাশুরপোর বাড়ির রাস্তা ধরল। নারকোলপিসিকে সেইখানেই পেয়ে একটা দুর্ভাবনা তার কাটল।

বিষ্ণুকে দেখে নারকোলপিসি কেঁদে ফেললেন। বিষ্ণুর ওপর তিনি নির্ভর করতে পারেন নি সে দোষ তাঁর। দুকুল হারাবার ভয়ে আঁকুপাঁকু হয়ে পালিয়ে এসেছিলেন ভাশুরপোর দজ্জাল বৌয়ের সংসারে। কিন্তু বৌ ছেড়ে কথা কয়নি। ভাইপোকে পেয়ে ভাশুরপোকে ঠেকার দেখান? শিক্ষা হল ত এবার? আশমিটিয়ে কথার তুবড়ি ছুটিয়েছিল কুঁদুলে বৌ।

—'যাক যা হবার হয়ে গেছে—তুমি ফিরে চল।' বলে নতুন করে ভরসা দিল বিষ্ণু। পিসিমা তাই শুনে আর দেরি করলেন না। কানে তুলো গুঁজে তড়বড় করে বাক্সবিছানা গুছিয়ে ফেললেন পাঁচ মিনিটে। বিষ্ণু রিকশা ডেকে আনল। পিসিমা আর তাঁর সম্বলের ভার রিকশাওলার হাতে দিয়ে নিজে হাঁটতে হাঁটতে এগোল আনন্দ নিয়োগী লেনের দিকে।

বাড়ি পোঁছতে রোদ উঠে গেল। বিষ্ণু মনে কোন হিংসা না রেখেই গোপীকান্তবাবুর কাছে যাচ্ছিল ভাড়া শোধ করে চাবি নিয়ে আসতে। গোপীকান্তবাবু তার আগেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। এক জোড়া নতুন চাবি বিষ্ণুর হাতে দিয়ে বললেন, 'এ চাবিদুটো আপনিই রাখুন—মনে করুন তালাটা আপনার।'

টাকা সেদিন কিছুতেই নিলেন না গোপীকান্তবাবু।

পরদিন বিষ্ণু যেতে টাকা নিয়ে রসিদ লিখতে লিখতে বললেন, 'পিসিমার মুখে সব শুনেছেন নিশ্চয়!'

—'কই—না তো!'

—'এই দেখুন।' গোপীকান্তবাবু রসিদ লেখা বন্ধ করলেন।—'তবে কি আপনি ভেবেছেন আমি সত্যিই আপনার পিসিমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিলুম?'

বিষ্ণু বোকার মত তাকাল।

—'আপনার পিসিমা হঠাৎ এসে আমায় খবর দিলেন যে আপনি বাড়ি ফেরার আগেই তিনি তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে চলে যেতে চান, এবং আমায় বলে গেলেন সদর দরজায় তালা দিয়ে দিতে। আমার হল উলটো বিপত্তি। কী করি, বাধ্য হয়ে আপনার পিসিমার কথা রাখতে হল। শেষে অনেক রাত অবধি আপনার জন্যে বসে থেকে শুতে গেলুম। ভেবেছিলুম আপনি এসে নিশ্চয় আমাকে ডাকবেন।'

দরজায় তালা লাগানর কাহিনী শুনে বিষ্ণুর মায়া হল ভদ্রলোকের ওপর। ভণ্টুও ভুল বুঝেছিল তার বাবাকে। এই কি ওঁর শাস্তি ?

বিষ্ণু তার পিসিমার ত্রুটি মানিয়ে নিল। চলে আসার আগে গোপীকান্তবাবুকে ধন্যবাদ জানাল নতুন তালাটা উপহার দেবার জন্যে।

সবই হল কিন্তু একটা ঘটনা বিষ্ণুর অজানা রয়ে গেল। সে জানতে পারল না যে পিসিমাকে নিয়ে ফেরবার কিছুক্ষণ আগে শান্তা এসেছিল।

বিষ্ণুর চিঠি পেয়েও শান্তা মেনে নিতে পারেনি যে কাজরী তার ঈর্ষার অযোগ্য বা তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী নয়। মনের জ্বলুনিতে বেশ কিছুদিন সে তাই ছটফট করেছিল।

কমলাদিকে আভাস দিতে তিনি বলেছিলেন যে কষ্ট অবিশ্বাস করে পাওয়ার চেয়ে বিশ্বাস করে পাওয়া ভাল।

কমলাদি আরও বললেন, 'এমনও হতে পারে যে তুমি দূর থেকে বিষ্ণুকে দেখছ। দূর থেকে পাহাড়কেও ছোট দেখায়—কাছে গেলে ভুল ভাঙ্গে। হয়ত ওর মনের সঙ্গে তুমি পাল্লা দিতে পারছ না।'

কমলাদির কথাই ঠিক এই মনে করে শান্তা ভেবেছিল কাজরীর প্রতি বিষ্ণুর অহেতুক সৌজন্য সে ক্ষমা করে নেবে। বিষ্ণু যে-দৃষ্টিতে কাজরীকে দেখে তাতে কাজরীর জীবন ধন্য। তাবলে কাজরীর ঐটুকু

আত্মপ্রসাদে বিষ্ণু তার অভিনেতা-জীবন সার্থক বলে মনে করবে এও হতে দেবে না শান্তা। বিষ্ণুকে প্রমাণ করতে হবে যে অভিনয়কে পেশা করেও তার অগ্রগতির ব্রত ভঙ্গ হয় নি—তার জীবন আদর্শচ্যুত হয়নি।

রবিবার সকালে উঠেই শান্তা তাই চলে গিয়েছিল বিষ্ণুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

বাড়ির সদর দরজায় তালা দেখে শান্তা অবাক হয়ে গিয়েছিল। জানলা দিয়ে বিষ্ণুর ঘরের ভেতর তাকিয়ে দেখল জামাকাপড় বিছানা পরিপাটি। মনে হয় রাত্রে কেউ ছিল না এ ঘরে।

হতভম্ব হয়ে শান্তা ফিরে গেল। এমন অনেক রাত্রেই বিষ্ণু হয়ত বাড়ি আসে না। পতন এতদূর গড়ালে তার কথা মনে আনাও বেহায়াপনা!

তবু বাড়ি ফিরে শান্তা খস খস করে চিঠি লিখে ফেলল বিষ্ণুকে। মনে যা এল তাই লিখল। লিখল যে বিষ্ণুর এই পরিণতির জন্যে কাজরীকে দায়ী করলে তাকে হিংসে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিষ্ণু যদি তা বুঝেও না বোঝে তবে শান্তার আর কোন মায়া নাই তার ওপর। শান্তার এইটুকু অনুরোধ যে ভবিষ্যতে বিষ্ণু যেন কাজরীর নামের সঙ্গে তার নাম কোনদিন না জড়ায়।

পনের

চিঠিখানা 'উত্তরায়ণ'-এর ডাকবাক্স থেকে বেহাত হয়ে গেল। মেয়েলী হাতে বিষ্ণুর নামঠিকানা লেখা নীল খামখানার লোভ তুলাল সামলাতে

পারল না। বিষ্ণু একদিন দুলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। আজও থাকত যদি না সে তার আপত্তি অগ্রাহ্য করে 'উত্তরায়ণ'-এ চাকরি নিত। বিষ্ণু কেন চাকরি নিল দুলালকে তা বলে দিতে হবে না। কিন্তু সুযোগ পেলেই দুলাল সে গুড়ে বালি ঢেলে দেবে। অভিনয় করার শখ জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবে।

দুলাল তাবলে আশা করেনি যে সুদর্শনচক্র শাস্তার চিঠির রূপ ধরে এত সহজে এসে পড়বে তারই হাতে। চিঠিখানা পড়তে পড়তে তার চোখেমুখে আনন্দ উথলে উঠল। মনে মনে বলল, ব্যাঙের মত বিষ্ণু গিয়ে পড়েছে কাজরীর গ্রাসে। খবরটা প্রমাণসহকারে মামাকে জানালে আর কথা নেই। কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

হলও তাই। দু-একদিন বাদেই কার্তিকবাবু বিষ্ণুকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। আর কেউ ছিল না। কার্তিকবাবু গুম হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন, 'দেখুন বিষ্টবাবু কদিন ধরে আপনাকে একটা কথা বলব বলব ভাবছি।'

—'বলুন।'

—'আপনি উচ্চশিক্ষা ও উচ্চআদর্শে মানুষ হয়েছেন। আমাদের লাইনের নোংরা আঁটঘাঁটগুলোর সঙ্গে আপনার তেমন পরিচয় নেই। কিন্তু আপনি যদি এ লাইনে থাকতে চান তাহলে সে আঁটঘাঁটগুলো বেশ ভাল করে আপনাকে জেনে নিতে হবে। নইলে হঠাৎ পা পিছলে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।'

—'আমার পা পেছলাবার কোন লক্ষণ দেখেছেন কি ?'

—'না—না। বরঞ্চ আপনার চরিত্রের কথা গর্ব করে আমি বলে বেড়াই সকলকে। তবুও মনে হল আপনাকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য।'

বিষ্ণুর সন্দেহ হয়েছিল যে কার্তিকবাবুর আকস্মিক সতর্কবাণীর সঙ্গে তার সেদিন কাজরীর বাড়ি যাওয়ার হয়ত কোন সম্বন্ধ আছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে আত্মসম্মানে বাধল। ভাবছিল ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে

পড়বে কি না। এমন সময় কার্তিকবাবু চেয়ারের বাঁয়ে হেলে বললেন, 'আরও একটা কথা আমার বলবার আছে। আপনারা এই যে অভিনয় করেন, তার মধ্যে কী না করতে হয়—চুরি, ডাকাতি, খুন, যুদ্ধ, প্রেম, বিয়ে। যাই করুন রঙ্গমঞ্চের ওপর তার হিসেবনিকেশের বালাই থাকে না। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের বাইরে যা করবেন তার পাপপুণ্য আছে, ফলাফল আছে।'

বিষ্ণু এবার আর থাকতে পারল না। বললে, 'মাপ করবেন, আপনি কি এতক্ষণ আমায় উপদেশ দিলেন শুধু এই কথা মনে করিয়ে দিতে যে মাঝে একদিন আমি কাজরীর বাড়ি গিয়ে ভাল করিনি ?'

কার্তিকবাবু ভুরু তুলে বিষ্ণুর দিকে তাকালেন। কোন জবাব দিলেন না।

বিষ্ণু বিরক্ত হয়ে চেয়ারের হাতল দুটো ধরে বলল, 'আমি নেহাত বাধ্য হয়েই গিয়েছিলাম। যদি কারণটা জানতে চান কাজরীকেই জিজ্ঞেস করবেন। তবে এ কথা বলতে বাধা নেই যে কাজরীর বাড়ি যেতে আপনার অনুমতি লাগে তা জানলে আমি হয়ত যেতাম না।'

ব্যাপারটা ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল। বিষ্ণু যে কাজরীর বাড়ি গিয়েছিল এ আবার নতুন খবর! তাই নিয়ে সেই রাত্রেই কাজরীর সঙ্গে কার্তিকবাবুর নিদারুণ ঝগড়া হয়ে গেল। কার্তিকবাবু বিষ্ণুর যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করতে কাজরী রুখে ওঠে। কার্তিকবাবুর মেজাজ তাতে চড়ে যায়। চোখ রাঙিয়ে সাবধান করে দেন তিনি যে এক পক্ষের দুর্বলতাকে অপরপক্ষ প্রশ্রয় দিলে দুপক্ষই দায়ী হবে তার জন্যে।

কাজরী বিদ্রোহ করে 'উত্তরায়ণ'-এ যাওয়া বন্ধ করে দিল।

কার্তিকবাবুরও গোঁ চেপে গেল। কয়েকদিন অপেক্ষা করে দুলালকে ডেকে বললেন, 'ওকে খোশামোদ করবার জন্যে রোজ রোজ আর গাড়ি পাঠিও না। দেমাকটা একবার না ভাঙ্গলে ওর মাটিতে পা পড়বে না। তুমি অন্য হিরোয়িনের খোঁজ কর।'

দুলাল তাতানর সুযোগ নিয়ে বললে, 'ক ডজন হিরোয়িন আপনার চাই বলুন, আমি কালই লাইন লাগিয়ে দেব। দেশে ভাতকাপড়ের দুঃখ থাকতে আবার হিরোয়িনের অভাব!'

দুলালের পরামর্শে কার্তিকবাবু 'অচলা' বলে একটি মেয়েকে নায়িকা সাজিয়ে চালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মেয়েটি প্রমাণ করে দিল যে সে সত্যিই অচলা, এবং নায়িকা হবার ঘন ঘন সুযোগ পেলে 'উত্তরায়ণ'-কেও সে অচল করে দিতে পারে।

আত্মাভিমানের চেয়ে আত্মরক্ষা বড়। কার্তিকবাবু তাই একদিন রাতারাতি ভোল পালটে ফেললেন। বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা হতেই তার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'আপনি দেখছি সত্যিই ছেলেমানুষ! সেদিন আপনাকে ঠাট্টা করে কী বলেছি আর তাইতে আপনি কাজরীর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দিলেন ?'

বিষ্ণু ঠিক বুঝতে পারল না কার্তিকবাবুর কথা। বললে, 'কাজরী তো তারপর থেকে 'উত্তরায়ণ'-এই আসেনি—সুতরাং তার সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি বন্ধ করার সুযোগই বা হল কবে ?'

—'কথাটা একই দাঁড়াল। আপনি তার বাড়ি গিয়ে না সাধলে সে 'উত্তরায়ণ'-এ আসবে না। এও সে চায় যে আমি স্বীকার করি আপনার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা খেলো নয়। আমি তা অস্বীকারই বা করব কেন ? একজন খেলো না হলে আর একজন খেলো হতে পারে না। এক হাতে তালি বাজে না। এতো জানা কথা।'

বিষ্ণু তবুও সংশয়ের মধ্যে রয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'আমায় কী করতে বলেন ?'

—'মানে, আজ কি কাল সন্ধ্যার দিকে না হয় গেলেন কাজরীর বাড়িতে। আপনি বুঝিয়ে বললেই তার রাগ পড়ে যাবে।— হ্যাঁ, আপনি হিরোর পার্টে প্রোমোশান পাবার পর আপনার মাইনে এক শ টাকা করে দেওয়া হয়েছে সেটা আপনাকে জানান হয়নি। আপনার পাওনা টাকাটা মনে করে নিয়ে যাবেন।'

ষোল

কাজরীকে 'উত্তরায়ণ'-এ ফিরিয়ে আনাই কার্তিকবাবুর উদ্দেশ্য তা বুঝলেও বিষ্ণু পরদিন সন্ধ্যাবেলা কাজরীর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

শেষ রাস্তাটার মোড় ঘুরতেই বিষ্ণু দূর থেকে দেখতে পেল কাজরীকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল—বিষ্ণুকে দেখে ঘরের ভেতর চলে গেল।

কলিং-বেল টিপতে দরজা খোলার আওয়াজ হল। কাজরী নয়, বিষ্ণুকে অভ্যর্থনা করল এক বুড়ি ঝি। কোন প্রশ্ন না করেই বিষ্ণুকে ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে বিষ্ণু থতমত খেয়ে গিয়েছিল প্রথমটা। সে বাড়ি ভুল করেনি তো? যেখানে ফরাশ ছিল সেখানে সোফাসেট—একপাশে বেদীর মত করে সাজান ডিভান--টেবিলের ওপর রাক্ষুসে ফুলদানি ভরা এককাঁড়ি ফুল—দেয়াল থেকে আয়না আর নগ্নতাবাদী ছবিগুলো অপসৃত—তাদের জায়গায় রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী, বিবেকানন্দ ও নেতাজীর ছবি। বিষ্ণু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কাজরীর পাগলামির কথা।

একটু পরেই কোরা তাঁতের কাপড় পরে কাজরী এসে ঘরে ঢুকল চায়ের পেয়ালা হাতে। বিষ্ণু এগিয়ে গিয়ে পেয়ালাটার ভার নিজের হাতে নিল। কাজরী সোফায় বসতে বসতে বললে, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো।'

বিষ্ণু অন্য একটা সোফায় বসে পড়ে বললে, 'আগের দিনও তো দাঁড়িয়েছিলুম—সেদিন তো কই লৌকিকতা করনি!'

—'আমি সেদিন যা ছিলুম আজ তা নই। তুমি আমায় কতখানি কম ঘৃণা করলে তাই দিয়ে নিজেকে বিচার করেছিলুম সেদিন।'

চায়ের পেয়ালাটা মুখ থেকে নামাতে গিয়ে হঠাৎ বিষ্ণু লক্ষ করল কাজরী তার জলভরা চোখদুটো লুকোবার চেষ্টা করছে। বিষ্ণু দেখে ফেলতে কাজরী তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ মুছে জোর করে হেসে বিষ্ণুর দিকে তাকাবার চেষ্টা করল।

বিষ্ণু বললে, 'আজ তোমায় প্রথম কাঁদতে দেখলুম।'

কাজরীর মনে হল বলে, সকলকার সামনে সকলে কাঁদতে পারে না। বললে, 'আজ হঠাৎ তোমার দয়া হল যে বড় ?'

বিষ্ণু টিপ্পুনি কেটে বললে, 'কার্তিকবাবুকে না বলে তোমার এখানে আসা যায় না, সেদিন এসেছিলুম তা না জেনে—আজ এসেছি তাঁর অনুরোধে।'

কাজরী গম্ভীর হয়ে উঠে দাঁড়াল। টেবিলের পাশে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আমায় আর যা ইচ্ছে বল কিন্তু পরাধীন বলে গাল দিও না। আমি স্বাধীন এইটেই আমার সব চেয়ে বড় অহংকার। সেখানে আঘাত দিলে আমি সহ্য করব না।'

বিষ্ণু তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরিয়ে বলল, 'আমি মানলাম তুমি স্বাধীন। কিন্তু তোমার জীবনধারার ওপর, 'উত্তরায়ণ'-এর ওপর, তোমার তো একটা কর্তব্য আছে! 'উত্তরায়ণ' কী দোষ করল যে তুমি তার সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দিতে চাও? যদি আমি কোন অপরাধ করে থাকি আমাকে 'উত্তরায়ণ' ছেড়ে চলে যেতে দাও। তোমার স্বার্থত্যাগের কথা উঠছে কেন?'

—'স্বার্থত্যাগের মত মহৎ কাজ আমার মত নগণ্য প্রাণীর জন্যে নয়। আমি স্বার্থত্যাগ করলে তার মধ্যে কোন মহিমা কেউ খুঁজে পাবে না কোনদিন। তাই স্বার্থত্যাগ করতে আমি চাই না। আমি চাই স্বার্থপরের মত বাঁচতে। স্বার্থের জন্যেই আমি 'উত্তরায়ণ' ছাড়তে চাই।'

বিষ্ণু কাজরীকে আবার আঘাত দিয়ে বসল—'তার মানে সংসারী হতে চাও নাকি?'

কাজরী জানতে দিল না কী ভীষণ আহত সে হয়েছে বিষ্ণুর

এই কথায়। ম্লান হাসি হেসে বলল, 'সংসারী হবার উপায় আমার নেই। তবু আমি সংসারী হবার যোগ্য হতে চাই।' বলেই সে তাড়াতাড়ি বারান্দায় চলে গেল।

এবার বিষ্ণুকে নতুন করে ভাবতে হল। কাজরীর মনের দ্বন্দ্ব যে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না বিষ্ণু তা বুঝতে পারল। কিন্তু কী হয়েছে কাজরীর? তার এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ কী? বিষ্ণুর সন্দেহ হতে লাগল যে কাজরীর পরিবর্তনের সঙ্গে সে নিজে জড়িত কিনা। তা যদি না হত, কাজরীর সমস্যা যদি ব্যক্তিগতই হত, সে কি বিষ্ণুর সামনে নিজের দুর্বলতা এমন ভাবে প্রকাশ করত?

বিষ্ণুর মনে হল কাজরী হয়ত তাকে কিছু একটা বলবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে অথচ বলতে পারছে না। কথাটা জিজ্ঞেস করতেও বিষ্ণুর সাহস হচ্ছিল না—যদি কাজরী তার কাছে এমন কিছু চেয়ে বসে যা সে দিতে পারবে না! তাহলে সেদিনকার হঠাৎ আবিষ্কার করা অসূর্যম্পশ্যা কাজরী শতভঙ্গ হয়ে আবার ফিরে যাবে। আর কোনদিন খোলস ছেড়ে বাইরে আসতে পারবে না।

ঠিক এই সময়ে কাজরী ফিরে এল। বিষ্ণুর দিকে না তাকিয়েই বললে, 'তোমার কাছে একটা আবদার করব। মঞ্জুর করবে?'

বিষ্ণুর গলা শুকিয়ে গেল। নিজেকে বাঁচিয়ে সে বললে, 'মঞ্জুর করার মত হলে নিশ্চয় করব।'

কাজরী দেয়ালের দিকে মুখ করে বললে, 'আমায় তুমি এ জঘন্য জীবন থেকে উদ্ধার কর—আমায় মানুষ হবার রাস্তা বলে দাও।'

বিষ্ণু সহজ ভাবে নিতে পারল না কাজরীর আবদারটা। মানুষ হওয়া বলতে কাজরী কী বোঝে? মানুষই বা সে হতে চায় কেন? সে কী বিষ্ণুকেই চায়? আর সেইজন্যে প্রমাণ করতে চায় যে তার জঘন্য জীবন পরিত্যাগ করে সমাজগণ্য জীবন গ্রহণ করার যোগ্যতা তার আছে? না—এ তার একটা শখ—কিছুদিন হাওয়া বদল করে আসার মত?

বিষ্ণুকে সন্দেহ-কীট দংশন করল। এও হতে পারে যে কাজরীর এটা অভিনয়—বিষ্ণুকে পথ ভোলানই তার উদ্দেশ্য। বিষ্ণুর মনে পড়ল কার্তিকবাবুর কথা—এ লাইনের আঁটঘাঁটগুলো ভাল করে না জানলে পা পিছলে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

বিষ্ণুকে চুপ করে থাকতে দেখে কাজরী ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'কোন উত্তর দিলে না যে!'

বিষ্ণু বলল, 'আমি ভাবছি তুমি মানুষ হওয়া বলতে কী বোঝ।'

কাজরী সহজ ভাবেই জবাব দিল—'আমি বুঝি এমন জীবন যাতে দিনের শেষে অভিশাপ না কুড়িয়ে আশীর্বাদ কুড়োবার সুযোগ আমি পাই।'

বিষ্ণু উঠে দাঁড়াল। তার ভুল ধারণা মাটির ঢেলার মত ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। অস্থির হয়ে সে কিছুক্ষণ পায়চারি করে বললে, 'ঐটুকু পেলেই কি তুমি সন্তুষ্ট হও?'

—'হ্যাঁ। এর চেয়ে বেশী আমি আর কিছু আশা করি না।' বলে কাজরী কটাক্ষ করল বিষ্ণুর দিকে। মনে হল বিষ্ণুকে ঠেস দিয়েই সে কথাটা বলেছে।

বিষ্ণুর মনে পড়ে গেল তাদের দেশ লালহাটীর কথা। স্কুলে পড়তে পড়তে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে বিষ্ণুকে পড়াশুনো ছেড়ে দিতে হয়েছিল মাঝখানে। সে সময় বাবা তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দেশের বাড়িতে, লালহাটীর বিখ্যাত বৈদ্য আশুকবিরাজের হাতে চিকিৎসার ভার দিয়ে। প্রায় দু-বছর বিষ্ণু লালহাটীতে ছিল। দু-বছর কাটতে যেন দশ বছর লেগেছিল তার। সে সময়ে দিনের পর দিন বিষ্ণু দেখেছিল পল্লীগ্রামের দুরবস্থা, চিনেছিল তার গ্রামের ভাইবোনদের। মনে একটা বালকসুলভ সংকল্পও জেগেছিল যে বড় হয়ে সে নিজের ভাগ্যোন্নতির পথ না বেছে, দেশোন্নতির পথ বেছে নেবে। পরে কলকাতায় ফিরে

এসেও সে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখেছে যে খুঁজে খুঁজে স্বার্থত্যাগী ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে এক সমাজসেবার দল গড়েছে—তাদের নিয়ে চলেছে বস্তিতে বস্তিতে, গ্রামে গ্রামে—আর্তকে সুস্থ করতে, অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান করতে, অমানুষকে মানুষ করতে।

আজ হঠাৎ বিষ্ণুর লজ্জা হল সেই সব উচ্চআদর্শের চিন্তা তার মন থেকে চলে গিয়েছিল বলে। কাজরী যেন আজ মনে করিয়ে দিল, বাস্তবে পরিণত করতে বলল স্বপ্নগুলো।

এতক্ষণ ভাবতে ভাবতে বিষ্ণুর মুখের চেহারা বদলে গেছে। সে গম্ভীর হয়ে বললে, 'তোমার জন্যে যদি আমি কোন কঠিন পথ বেছে দিই, তুমি এগোতে পারবে ?'

—'পারব।'

—'বাধা পেয়ে ফিরে আসবে না ?'

—'না।'

বিষ্ণু একটু থেমে আবার বলল, 'বেশ, তাহলে আজ থেকে তোমার নতুন জীবন শুরু হোক।'

কাজরী বিষ্ণুকে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, বিষ্ণু বাধা দিয়ে বললে, 'বন্ধুর কাছে সাহায্য নিলে মাথা হেঁট করবার কিছু নেই।'

কাজরী বিষ্ণুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ মাথা হেঁটের মর্ম তুমি বুঝবে না।' বলে সে একরকম জোর করেই বিষ্ণুর পাদস্পর্শ করল।

বিষ্ণু বললে, 'প্রণাম যখন করলেই তখন আশীর্বাদ করি তোমার জীবন সার্থক হোক।'

কাজরী হাসল—'এবার আদেশ কর।'

বিষ্ণু বললে, 'তার আগে তোমার নতুন জীবনের নতুন নামকরণ হোক।'

—'কী নাম ?

—'ঊষা।'

—'পদবী ?'

—'দেবী।'

কাজরী খুশি হয়ে বলল, 'তাহলে আজ থেকে 'উত্তরায়ণ'-এর চাকরি থেকে আমার ছুটি তো ?'

—'না।'

কাজরীর মুখ ভার হয়ে গেল।

বিষ্ণু বললে, 'তোমায় দেখাতে হবে যে আত্মমর্যাদা রক্ষা করে তুমি জীবিকা উপার্জন করতে পার—প্রমাণ করতে হবে যে তোমার জীবিকা যাই হোক তোমার জীবনের তুমিই মালিক।'

কাজরী মাথা নীচু করে বলল, 'বেশ।'

সতের

কাজরী 'উত্তরায়ণ'-এ ফিরে আসতে দুলাল বুঝল যে বিষ্ণুকে দূর করতে গিয়ে সে তার সঙ্গে কাজরীর সম্বন্ধ আরও নিকট করে ফেলেছে এবং তার বিচক্ষণ মামা ব্যবসার মুখ চেয়ে তা হজম করতে রাজী হয়েছেন। আগে 'উত্তরায়ণ' থেকে ফেরবার সময় কাজরী কার্তিকবাবু বা দুলালের গাড়িতে যেত কিন্তু এখন সে যায় ট্যাক্সিতে বিষ্ণুর সঙ্গে। তাছাড়া অকৃতজ্ঞের মত সে কার্তিকবাবুর অতদিনের ভাড়া করা বাড়ি ছেড়ে অন্য পাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। আর এও দেখা গেছে যে বিষ্ণুর সঙ্গে রোজ সে তার বাড়ির দিকেই যায় না।

দুলাল মনে মনে জ্বলতে লাগল। কাজরী আর বিষ্ণুর এই

বেপরোয়া মেলামেশা চিরদিনের জন্যে বন্ধ না করা পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

অনেক পেঁচালো ভাবনা মগজে ঢুকিয়ে দুলাল দেখল যে একমাত্র শান্তার সাহায্য পেলে তার উদ্দেশ্য তাড়াতাড়ি সফল হতে পারে। শান্তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে সে তাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

যে চিঠিখানা দুলালের হস্তগত হয়েছিল তাতে শান্তার ঠিকানা লেখা ছিল না। পুরো নামও নয়। দুটোই জানবার জন্যে দুলালকে তাই রীতিমত গোয়েন্দাগিরি করতে হল। শেষে কোন ছেলে তাদের সঙ্গে স্কুলে পড়ত, পরে বিষ্ণুর সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখেছে তা খোঁজ করতে করতে বেরিয়ে পড়ল শান্তার সব খবর। দুলাল সোজা গিয়ে দেখা করল শান্তার সঙ্গে, কলেজে। পরিচয় দিল বিষ্ণুর বাল্যবন্ধু বলে। বললে, বন্ধুকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে শান্তার সাহায্য নিতে এসেছে সে।

শান্তা দুলালের দিকে বিরক্ত হয়ে তাকিয়ে বলল, 'আপনার বন্ধু বিপদে পড়েছে, আমার তাতে কী ?'

দুলাল নম্রভাবে বলল, 'আপনি ছাড়া তার সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষা আর কে করবে বলুন ?'

শান্তা বুঝল দুলাল জানে তার সঙ্গে বিষ্ণুর মনের সম্বন্ধের কথা। যে বন্ধুকে বিষ্ণু বিশ্বাস করেছে তাকে চট করে অবিশ্বাস করতে পারল না সে। জিজ্ঞেস করল—'আপনাকে আপনার বন্ধু পাঠিয়েছে না আপনি নিজে এসেছেন ?'

—'আপনি কি পাগল হলেন ? বিষ্ণু আমাকে পাঠাবে আপনার কাছে ?—তাছাড়া আমি যে-বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছি তাকে সে তো বিপদ বলে স্বীকারই করে না। সে খেলায় মত্ত। কিন্তু বুঝতে পারছে না যে সে আগুন নিয়ে খেলছে।'

শান্তা অসহায় ভাবে বলল, 'কিন্তু আমি কী করতে পারি বলুন ?'

দুলাল বললে, 'তা আমি জানি না। তবে আমার মনে হল বিষ্ণু অধঃপতনের চরমে পৌঁছবার আগে আমার উচিত তার আপনার জনের

কাছে দুঃসংবাদটা পৌঁছে দেওয়া। বিষ্ণুর বাবাকে বলা বৃথা। তাই এলাম আপনার কাছে।'

—'আমার দ্বারা কোন উপকার হবে বলে আমি মনে করি না।'

—'তাহলেও মনে রাখবেন আমার কথাটা। আমার কার্ডটাও রাখুন —এতে আমার ঠিকানা, টেলিফোন-নম্বর আছে। দরকার পড়লে ডেকে পাঠাতে দ্বিধা করবেন না।' বলে একটা ছোট সাদা কার্ড শান্তার হাতে দিয়ে দুলাল চলে যাচ্ছিল।

শান্তা বাধা দিল।—'আপনি কি 'উত্তরায়ণ'-এর মালিক ?'

—'না, আমার মামা। তবে ভবিষ্যতে আমিই মালিক হব, লোকে তাই বলে।'

—'তাহলে আপনার মামার সাহায্য নিচ্ছেন না কেন ?'

দুলাল একটা ঢোঁক গিলে বলল—'সব কথা যখন জানেন তখন আপনাকে বলতে বাধা নেই যে আমার মামা আর একজন উপযুক্ত হিরোয়িন না পাওয়া পর্যন্ত কাজরীকে 'উত্তরায়ণ' থেকে সরাতে সাহস করছেন না। আর কাজরী যতদিন আছে বিষ্ণুকেও সরান যাবে না, শোধরান ত রের কথা।'

শান্তা আর কিছু বলল না। দুলাল নমস্কার করে চলে গেল সাদা গাড়িখানা হাঁকিয়ে।

বাড়িতে গিয়ে শান্তা দিদিমাকে বলল দুলালের কথা। দিদিমা দুলালকে না দেখেই বললেন, 'বন্ধু না ছাই। বন্ধু হয়ে কেউ বন্ধুর কেচ্ছা রটিয়ে বেড়ায় ?'

—'ভদ্রলোক তেমন কিছু বলেন নি—বরঞ্চ সত্যি সত্যি মুষড়ে পড়েছেন বলে মনে হল।'

—'সে যাই হোক, তুমি আর বিষ্টুর ঐ বন্ধুটিকে আমল দিও না।'

দিদিমা সৎপরামর্শ দিলেন বটে কিন্তু নিয়তিকে ঠেকাতে পারলেন না।

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই একদিন বিকেলে গুরুপদবাবু বাড়ি ফিরলেন অজ্ঞান অবস্থায়—চিকিৎসক রোগ ধরার কল পাতবার আগেই পরদিন সকালে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। জানা গেল করোনারি থ্রমবসিস্‌।

খবর পেয়ে দুলাল ছুটে এল। বাড়ির ছেলের মত সাহায্য করল কাজেকর্মে। দিদিমা তারপর আর রুখতে পারলেন না দুলালকে। সংসার তখন ছন্নছাড়া হয়ে যেতে বসেছে—নাতিনাতনীরা কারুর শাসন মানছে না—শান্তার কাকাজ্যাঠারা বৈষয়িক ভাগবটরার দিকে শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে বসে আছেন—এ অবস্থায় দিদিমা দুলালের অযাচিত সাহায্য ফিরিয়ে দিতে পারলেন না। সেই সুযোগ নিয়ে দুলাল শান্তাদের বাড়ির সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলল।

গুরুপদবাবুর মৃত্যুসংবাদ পেয়েই বিষ্ণু শান্তাকে টেলিফোন করেছিল। শান্তা কথা বলেনি। বিষ্ণুর গলা শুনে রিসিভার রেখে দিয়েছিল। পরে বিষ্ণু শান্তাদের বাড়িতেও গিয়েছিল স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, শান্তাকে সান্ত্বনা দিতে—শান্তা দেখা করেনি।

কিন্তু এ কথা ঠিক যে পিতৃশোকে শান্তা ভেঙ্গে পড়েছিল। আরও ভেঙ্গে পড়েছিল বিষ্ণুকে এই দুঃসময়ে হারিয়ে।

এরই মধ্যে দুলাল একদিন শান্তা আর তার দিদিমার মন ভাল করবার জন্যে তাদের জোর করে নিয়ে গেল 'উত্তরায়ণ'-এ। থিয়েটার ভাঙ্গবার পর সে চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়ে দিল বিষ্ণুর বর্তমান গতিবিধির। তারা তিনজন শান্তাদের গাড়িতে বসে দেখল বিষ্ণু আর কাজরীকে একই ট্যাক্সিতে উঠতে, তারপর এ-গলি ও-গলি দিয়ে পৌঁছতে একটা নোংরা বস্তির সামনে। বস্তির বাসিন্দাদের রূপ দেখে শান্তা আর

দিদিমাকে শিউরে উঠতে হল। দুলালের কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্যি তা অস্বীকার করবার উপায় আর রইল না।

দিদিমা হাল ছেড়ে দিয়ে শান্তার বিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শান্তা কিন্তু বেঁকে বসল। বললে, তার পড়াশুনো এখনও শেষ হয়নি।

দুলালকে সালিসি মেনে দিদিমা একদিন কথাটা পাড়তে দুলাল বলল, 'পড়াশুনোর কি শেষ আছে? আর, মেয়েরা আজকাল লেখাপড়া শিখে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে বলেই তাদের দিন দিন কদর বাড়ছে। আমাদের থিয়েটারের লাইনই দেখুন না! শান্তাদেবীর মত মেয়েরা যেদিন নিজেদের স্থান অধিকার করে নেবেন সেদিন কাজরীর মত মেয়েদের আপনা থেকেই সরে যেতে হবে। হচ্ছেও তাই। এখন দুটি একটি উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমেয়ে থিয়েটারে যোগ দিচ্ছেন—আর সম্মানও পাচ্ছেন তেমনি। তাঁদের সম্মানে শুধু যে আমাদের মান বাড়ছে তা নয় দর্শকদেরও বুক দশ হাত হয়ে উঠছে—তাঁরা ভাবছেন যেন তাঁদেরই ঘরের মেয়ে।'

দুলালের কথার ধরন দিদিমার ভাল লাগছিল না। তিনি শান্তাকে বললেন, 'দিদি, আমার পূজোর যোগাড়টা করে দিয়ে এস তো ভাই!'

শান্তা চলে গেল। কিন্তু দুলালের কথাগুলো তার মনে বিঁধে রইল। দুলাল যা বলল তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একটা কঠিন প্রশ্নও শান্তার মনে জাগল—এ কার দোষ যে কাজরীর মত অজ্ঞাতকুলশীলা দুশ্চরিত্রা নটী তার কাছ থেকে বিষ্ণুকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারল? কাজরীর লজ্জা নেই। ভয়ও নেই। সে জানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলে শান্তাকেই নেমে আসতে হবে, তাকে উঠতে হবে না। তাই তার এই নীচ বিজয়-দুন্দুভি। কিন্তু শান্তা কি মুখ বুজেই সহ্য করবে এই হঠকারিতা?—না একবার

চেষ্টা করে দেখবে কাজরীর মুঠি থেকে বিষ্ণুকে ছাড়ান যায় কিনা ?

আঠার

সেদিন কাজরীর কথায় প্রেরণা পেয়ে বিষ্ণু উঠেপড়ে লেগে গেল তার বিস্মৃত সংকল্পের জীবনদান করতে। বন্ধুমহল থেকে কয়েকটি জানাশুনো সেবক-সেবিকা সংগ্রহ করে বিষ্ণু একটি ছোটখাট দল গড়ে তুলল। দলের নাম দিল 'ঊষা সংঘ'। কাজরীকে করল তার নেত্রী। তাকে বলল, 'মনে কর অভিনয় করার মতই তুমি নামলে 'ঊষাদি'র ভূমিকায় তোমার জীবন-নাট্যের এক অঙ্কে। সে অভিনয়কে তোমার রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মতই প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে।'

কাজরী বিষ্ণুর কথা অক্ষরে অক্ষরে মানবার চেষ্টা করতে লাগল। যতটুকু সময় 'উত্তরায়ণ'-এর জন্যে না রাখলেই নয় তা বাদে বাকী সময়টুকু উৎসর্গ করে দিল দলের কাজে।

'ঊষা সংঘ'-এর হাতেখড়ি দিতে বিষ্ণু বেছে দিয়েছিল একটা নোংরা বস্তি। বলেছিল, 'আজকের তারিখটা টুকে রেখে দাও। এক মাস পরে হিসেব করে দেখো কতদূর কী করতে পারলে।'

পরম উৎসাহে দলের সকলে হাতেনাতে কিছু করবার জন্যে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিনেই তাদের উৎসাহ বর্ষার চড়ুইভাতির মত ভিজে দই-চিঁড়ে হয়ে গেল। বস্তির বাসিন্দারা এক জোট হয়ে প্রতিবাদ

জানালেন।—কিসের প্রতিবাদ ? পরোপকারের ? দুঃখমোচনের ? সংস্কারের ? তারা বললেন, হ্যাঁ। অযাচিত সাহায্যকে আমরা সন্দেহের চোখে দেখি। কী চাই ? ভোট ? না ইজ্জত ? না গরিবের আক্কেলসেলামী ?

কাজরী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

লোকচক্ষুর অন্তরালে এ যেন একটা স্বতন্ত্র পৃথিবী। এখানে দুঃখ প্রচুর, সমস্যা অসংখ্য। তাই ন্যায়-অন্যায়ের সাধারণ বিচার দিয়ে কর্তব্যপালনের প্রশ্ন ওঠে না। চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন করতে বিচিত্র উপায় অবলম্বন করতেই হয়। একখানি কি বড় জোর দুখানি অপরিসর ঘর—তারই মধ্যে রান্না, খাওয়া, শোয়া, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ। সারা বস্তিতে একটি মাত্র জলের কল। এক পয়সার তৈলের মত তা থেকে সকলের চাহিদা মেটান অসম্ভব। পরিষ্কার ঘর, পরিষ্কার পরিধান এ তো বিলাসিতার কথা। কাজেই সরল অর্থনীতিটুকু বুঝতে কারুর কষ্ট হয় না। আছের চেয়ে নেই অনেক বেশী। ঘোমটা টানলে গা ঢাকে না। স্বভাব নষ্ট না করলে অভাব দূর হয় না।

বিষ্ণু আশা দিয়ে বলল, 'তা হোক। আমাদের বোঝাতে হবে যে এদের মঙ্গলসাধনে আমাদের কোন স্বার্থ নেই। বাড়তি উপায়ের জন্যে এদের শেখাতে হবে নানান ঘরোয়া শিল্প—যেমন বেতের ঝুড়ি, কাগজের ঠোঙা, খেলনা, এইসব তৈরি করা। সমবেত চেষ্টায় খরচ কমানর জন্যে খোলাতে হবে সমবায়-ভাণ্ডার, যৌথ-রন্ধনশালা। আর যেমন করে পারি একটা টিউব-ওয়েল আমাদের বসাতেই হবে।

বিষ্ণুর নির্দেশ মত 'উষা সংঘ' কাজ শুরু করে দিল।

সারা শীতকালটা কেটে গেল ঐ একটা বস্তি নিয়েই। সরস্বতীপূজো আসতে সকলের হুঁশ হল। দলের সবাই মেতে উঠল বস্তিতে ধুমধাম করে সরস্বতীপূজো করবে বলে।

আনন্দ নিয়োগী লেনে ঘরে ঘরে সরস্বতীপূজো হলেও পাড়ায় বারোয়ারি পূজোর রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু বিষ্টুদাকে পেয়ে পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের উৎসাহ জেগে উঠল। এক সকালে একখানি চটি একসারসাইজ বুক হাতে করে ছেলেমেয়েরা এসে বিষ্টুদাকে ধরল তার শয়নকক্ষে তারা সরস্বতীপূজো করবে। বিষ্ণুর হাতে সময় না থাকলেও ছেলেমেয়েদের কথা শুনেই সে নেচে উঠল। আর তাদের পাণ্ডা-পূজারী দুই হতে সে রাজী হয়ে গেল। অভিভাবকের দল প্রথমে ছেলেমেয়েদের এই উৎসাহকে অকালপক্কতা বলে নামঞ্জুর করলেও শেষ অবধি তাঁরা নির্লিপ্ত থাকতে পারলেন না। পূজোর দিন কয়েক আগে দেখা গেল আসল উদ্যোগীদের হটিয়ে দিয়ে তাঁরাই আসন দখল করে বসেছেন এবং কে কাকে দেখতে পারেন না তা ভুলে গিয়ে সকলে একমত হয়েছেন যে এ পূজো তাঁদেরই। ছেলেমেয়েরা কাজটা হাতে নিলেও তা সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব নিতে তাঁরা বাধ্য হলেন কারণ পূজো তো আর ছেলেখেলা নয়!

ছেলেমেয়েরা তাদের অভিভাবকদের এই মোড়লিতে রীতিমত নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। তা দেখে বিষ্ণু তাদের মন ফেরাল অন্য দিকে। বললে, 'তোমরা থিয়েটার করবে? থিয়েটার একরকম পূজো। জান তো? মা সরস্বতী লেখাপড়া যেমন ভালবাসেন তেমনি ছবি আঁকা, গানবাজনা, থিয়েটার করা এইসবও খুব পছন্দ করেন। তোমরা ভাল করে থিয়েটার করতে পারলে দেখো তিনি কত খুশি হবেন!' বিষ্ণুর কথা শুনে ছেলেমেয়েদের মনের মেঘ কেটে গিয়ে আবার রোদ্দুর ঝলমল করে উঠল।

সত্যি, বিষ্ণুর প্রেরণা ও পরিচালনায় ছেলেমেয়েরা এত ভাল অভিনয় করল যে তাদের মা-বাবারা গর্বিত না হয়ে পারলেন না। সবচেয়ে ভাল অভিনয় করেছিল ভগবানের ছেলে খুশী। গোপীকান্তবাবু খুশি হয়ে তাকে একটা মেডেল দেবার প্রতিশ্রুতি জানালেন।

উনিশ

যে বস্তিতে 'উষা সংঘ' কাজ আরম্ভ করেছিল সেখানে বহু কষ্টে চাঁদা তুলে এবং এক টিউব-ওয়েল কোম্পানীর মহানুভবতার সাহায্যে বিষ্ণু একটা টিউব-ওয়েল বসাবার ব্যবস্থা করে দিল। বস্তির বাসিন্দাদের আশীর্বাদের ঘটা নাড়া দিল সেবক সেবিকাদের মন। দ্বিগুণ উৎসাহে তারা কোমর বাঁধল নতুন কাজের জন্যে।

বিষ্ণু খুঁজে দিল আর এক বস্তি। দেখা গেল সেখানকার অবস্থা শুধু শোচনীয় নয়, মারাত্মক ভাবে অস্বাস্থ্যকর। কখন যে কোন মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় ঠিক নেই।

ভয় করতে করতে সত্যিই একদিন কলেরা রোগ রাতারাতি আক্রমণ করল সারা বস্তিটাকে।

সব কাজ ফেলে সেবক-সেবিকাদের তখন ছুটে যেতে হল পীড়িতদের প্রাণরক্ষা করতে। কিছু করার আগেই দুটি স্ত্রীলোক ও একটি শিশু প্রথম রাত্রেই মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে বস্তিরই একটা পরিত্যক্ত চালাঘরে রোগীদের স্বতন্ত্রীকরণ ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ফেলায় বিপদ অনেকটা বশ মানল। সাধ্যমত হাঁসপাতালেও পাঠিয়ে দেওয়া হল অনেক রোগীকে।

'উষা সংঘ'-এর ঘাড়ে নেওয়া দায়িত্ব কিন্তু পুরোপুরি পালন করা গেলনা। তার আগেই কাজ বন্ধ করে দিতে হল কাজরীর অসুখের জন্যে।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কাজরীর শরীর যে ভেঙ্গে পড়েছিল এ তার মুখ দেখে বোঝা যায়নি। বস্তি থেকে ফেরবার পথে

হঠাৎ একদিন সে অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ল ট্যাক্সিতে। বিষ্ণু পাশে বসেছিল। কাজরীর উষ্ণ হাত গায়ে ঠেকতেই চমকে উঠল। কপালে হাত দিয়ে দেখল আগুন। কাজরীর বেহুঁশ দুর্বল দেহটাকে সে নিদ্রিত শিশুর মত বাহুতে আশ্রয় দিল। এতদিন বিষ্ণু খুঁটিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেনি তার আর কাজরীর সম্বন্ধকে। কিন্তু আজ কাজরীর রুগ্নদেহের স্পর্শে তার মনে কোথায় যেন কোন সুপ্ত চেতনা সাড়া দিয়ে উঠল।

দলের দুজন স্বেচ্ছাসেবক, অনিল আর হারু, সঙ্গেই ছিল। উষাদি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে তারা প্রথমে বুঝতে পারেনি। যখন টের পেল তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল রীতিমত। হাঁসপাতালে নিয়ে যাবার কথা তুলল। বিষ্ণু বলল, 'আগে বাড়িতেই নিয়ে যাওয়া যাক—হাঁসপাতালে জ্ঞান হলে হঠাৎ ভয় পেয়ে যেতে পারে।'

অনিল আর হারুর সাহায্যে কাজরীকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল ডাক্তার ডাকতে। পাড়ার ডাক্তার কিরণবাবুকে পাওয়া গেল। তিনি প্রেসক্রিপশান লিখে দিয়ে মাথায় আইসব্যাগ দেবার ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। বলে গেলেন সকালবেলা খবর দিতে।

বিষ্ণুর সে রাত্তিরে বাড়ি ফেরা হল না। অনিল আর হারু চলে গেল। বিষ্টুদা কাজে আটকে পড়েছে, আজ রাত্তিরে বাড়ি আসতে পারবে না, এ সংবাদটা নারকোলপিসিকে জানিয়ে তারা খবর দেবে মণিদি আর বসন্তকে। মণিদি আর বসন্ত সকালে এসে পৌঁছলে তাদের হাতে কাজরীর ভার দিয়ে বিষ্ণু বাড়ি যাবে।

ঘণ্টাখানেক পরেই কাজরীর জ্ঞান হল। কিন্তু কয়েকদিন কেটে যাবার পরও আচ্ছন্ন ভাব কাটল না—জ্বরও বিশেষ কমল না। কিরণবাবু শেষকালে পরামর্শ দিলেন বড় ডাক্তার ডাকতে। ডাক্তার দাশকে ডাকা হল। তাঁর দৈনিক ষোল টাকা ফি ও দুর্মূল্য ওষুধপত্তরের টাকা যোগাড় করতে বিষ্ণুর জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে গেল।

কার্তিকবাবু কাজরীর চিকিৎসার অধিকাংশ ব্যয় বহন করলেও তাঁর দুশ্চিন্তা কাজরীর জন্যে তত হয়নি যত হয়েছিল তাঁর ব্যবসার জন্যে। দিন পনের পরে তিনি দেখলেন কাজরীর বিছানা ছেড়ে ওঠার আশা হয়ত আছে, কিন্তু তার সুস্থ হয়ে 'উত্তরায়ণ'-এ ফিরে আসতে অন্ততঃ কয়েক মাস।

তিনি মহাসঙ্কটে পড়লেন। এতদিন কি 'উত্তরায়ণ' বন্ধ থাকবে ?

দুলাল মামার দুর্ভাবনার কথা শুনে বললে, 'রাজা না থাকলেও রাজত্ব চলে আর কাজরী না থাকলে 'উত্তরায়ণ' চলবে না ? আপনি বলেন তো কালই আমি কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিচ্ছি। মাইনেটা একটু বাড়িয়ে দিলে হয়ত বি-এ এম-এ পাশ ভাল ঘরের মেয়েও পেয়ে যেতে পারেন।'

কার্তিকবাবু অনিচ্ছার সঙ্গে মত দিলেন।

শুভকাজে দুলালের বিলম্ব হয় না। দুদিনের মধ্যেই বড় বড় কাগজগুলোতে সে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিল—

শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় 'উত্তরায়ণ'-এর জন্য অবিলম্বে সম্ভ্রান্তবংশীয়া, উচ্চশিক্ষিতা অভিনেত্রী চাই। যোগ্যতা হিসাবে মাসিক বেতন ২০০৲ হইতে ৩০০৲ টাকা।

সঙ্গে সঙ্গে শান্তাকেও জানিয়ে এল সুখবরটা। বলে এল যে বিরক্ত হয়ে তার মামা শেষপর্যন্ত কাজরীকে জবাব দিয়েছেন এবং কাজরীর জায়গায় এমন কাউকে তিনি নিযুক্ত করতে চান যার উপস্থিতিতে 'উত্তরায়ণ'-এর সুনাম আর আভিজাত্য দুটোই বাড়বে।

—'আপনার বন্ধু ? তিনি কি এরপরও টিঁকে থাকবেন 'উত্তরায়ণ'-এ ?'

—'সেটা নির্ভর করে কাজরীকে যিনি স্থানচ্যুত করবেন তাঁর ওপর।'

শান্তার বুঝতে দেরি হল না দুলালের ইঙ্গিত। এর চেয়ে স্পষ্ট করে দুলাল কী বলবে !

সারারাত শান্তার ঘুম হল না। বিষ্ণুকে যদি উদ্ধারই করতে হয় এর চেয়ে ভাল সুযোগ পাবে না সে। এর পর কোন সুযোগই না পেতে পারে। অবশ্য কাজরীকে সরিয়ে তার সিংহাসন দখল করার মধ্যে কোন মান নেই। কিন্তু নষ্টযুদ্ধ জেতার মধ্যে যে আনন্দ আছে সামাজিক দুর্নাম তার কাছে নগণ্য। শান্তার কপাল টনটন করতে লাগল চিন্তার ভারে।

শান্তার অবচেতন মন এক রকম ঠিকই করে ফেলেছিল যে 'উত্তরায়ণ'-এ ঢোকা ছাড়া তার উপায় নেই। এখন শুধু নিজেকে বোঝান যে সে যা করতে চায় তা বিষ্ণুরই জন্যে—তার মধ্যে কোন গলদ নেই।

সকালে উঠেই শান্তা একটা ভাঁজকরা খবরের কাগজের পাতা নিয়ে কমলাদির বাড়ি চলে গেল। কমলাদি না বলবেন না শান্তা তা জানত। তার দরকার ছিল কমলাদির যুক্তি, যাকে রক্ষাকবচ করে সে সংশয়ের হাত থেকে বাঁচতে পারবে।

কমলাদি শান্তার মুখ দেখে বুঝেছিলেন যে তার এবারকার সমস্যাটা অন্যবারের চেয়ে গুরুতর। তবু কৌতূহল প্রকাশ না করে বললেন, 'কী খবর শান্তা ? অনেকদিন আসনি। বাড়ির সব ভাল তো ? ঠাকুমা ? ভাইবোনেরা ?'

—'হ্যাঁ।'

—'একটু চা খাবে ?'

—'না কমলাদি—এই খেয়ে আসছি।'

—'লজ্জা কী ? বোসো—।' বলে কমলাদি ভেতরে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে নিয়ে এলেন ট্রের ওপর।

শান্তা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে কমলাদির হাত থেকে ট্রেটা নিতে নিতে বলল, 'আমায় দিন—আমি চা করি।'

টেবিলের ওপর ট্রে রেখে শান্তা চা ছেঁকে এক পেয়ালা কমলাদিকে দিল—আর এক পেয়ালা নিজের জন্যে রাখল।

চায়ে চুমুক দিয়ে তারিফ করলেন কমলাদি। খানিক পরে জিজ্ঞেস করলেন—'এবার এম–এ দিয়েছিলে ?'

শান্তা মাথা নীচু করে বলল, 'না।'

কমলাদি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'আমার জিজ্ঞেস করাটাই অন্যায় হয়েছে— তোমার অত বড় বিপদ গেল।'

শান্তা কথার খেইটা হারিয়ে যেতে দিলনা। বললে, 'পড়াশুনো ছেড়ে দেব ভাবছি।'

—'লেখাপড়া ছেড়ে আর কিছু করবে বলে ঠিক করেছ ?'

শান্তা ইতস্ততঃ করে বলল, 'কিছু ঠিক করতে পারছিনা বলেই আপনার কাছে এলাম।'

কমলাদি হাসলেন। শেষ-চাটুকু চুমুক দিয়ে পেয়ালাটা রেখে দিলেন টেবিলের ওপর। তারপর বললেন, 'তোমার লক্ষ্য আগে যাত্রা পরে, না যাত্রা আগে লক্ষ্য পরে ?'

শান্তা চুপ করে রইল।

কমলাদি বললেন, 'বুঝতে পারনি বোধ হয় আমার প্রশ্নটা ? লক্ষ্য ঠিক করে যদি কেউ যাত্রা করে তাহলে একদিন না একদিন তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার আশা থাকে। চেষ্টা, জ্ঞান, সময়, সুযোগ এগুলোও সঙ্গে সঙ্গে থাকা দরকার। যার বেশী থাকে সে আগে পৌঁছয়। কেউ আবার লক্ষ্য স্থির না করেই যাত্রা শুরু করে। পরে বলে, এ কোথায় এলাম ? অবশ্য এর অন্য দিকও আছে। তুমি হয়ত যাত্রা করলে কোন লক্ষ্য না রেখেই। কিছুদূর গিয়ে একটা নতুন পথের সন্ধান পেলে, যে পথে কেউ গিয়েছিল আবার ঘাস জন্মেছে, বা যে পথে কেউ কোনদিনই যায়নি। ইচ্ছে হল তো দেখে এলে সে পথে কী আছে, সে পথ দিয়ে অন্য কোন নতুন রাজ্যে যাওয়া যায় কিনা। সাধারণ লোকে কিন্তু লক্ষ্য না রেখেই যাত্রা করে তবে তারা নতুন পথে যেতে চায় না। সবচেয়ে চওড়া পথটাই বেছে নেয়—যে পথে অনেকে গেছে—অনেকের মুখ থেকে যাতে জানা যায় সে পথে কী কী আছে। মহাজনো যেন গতঃ

স পন্থাঃ, এই বলে তারা অপরের লক্ষ্যটাকেই নিজের লক্ষ্য বলে মেনে নেয়। তাবলে আমি বলছিনা যে ছোট পথ পথ নয়—যে পথে কেউ যায়নি বা যে পথে কম লোক গেছে তা তুমি এড়িয়ে চল। তবে আমি তোমায় সেই পথেরই সন্ধান দিতে পারি যে পথে আমি গেছি। বলতে পারি আজ অবধি কী কী দেখেছি সে পথে—কিন্তু বলতে পারি না কাল কী দেখব।'

শান্তা গালে হাত দিয়ে কমলাদির কথা শুনছিল। বললে, 'আমার তো ভাবনা তাই – কোন পথে যাব ?'

কমলাদি হেসে বললেন, 'যদি যাওয়াটাই বড় হয় আর লক্ষ্য না থাকে, তবে খেলার মন নিয়ে যেতে হবে—জিতলে হাসব আর হারলে কাঁদব বললে চলবে না। আর যদি লক্ষ্য স্থির থাকে, এগিয়ে যাও—একটা পথ ভুল হলে আর একটা পথ খুঁজে পাবে। আর যে পথেই যাও আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করব তোমার যাত্রা শুভ হোক, সার্থক হোক।'

সন্ধ্যাবেলা দুলাল 'উত্তরায়ণ'-এ বসে আড্ডা মারছিল। কালীবাবু এসে বললেন, 'আপনার ফোন এসেছে।'

—'কোথেকে ?'

—'তা কিছু বললেন না। মেয়েলী গলা।'

—'মেয়েলী গলা ?' হন্তদন্ত হয়ে দুলাল চলে গেল ফোন ধরতে।

শান্তা। দুলালকে প্রথমেই প্রশ্ন করল যে 'উত্তরায়ণ'-এ যোগ দিলে তাকে কত মাইনে দেওয়া হবে—দু শ না তিন শ ?

দুলাল গদ গদ হয়ে বললে, 'বলেন কী ? আপনি যোগ দেবেন ? সে তো 'উত্তরায়ণ'-এর পরম সৌভাগ্য। মাইনের কথা জিজ্ঞেস করে লজ্জা দেবেন না।'

অনেকক্ষণ কথোপকথন চলল। দুলাল যেন কথাটা কোন বাইরের লোকের কাছে না ভাঙ্গে। বিষ্ণু? না—বিষ্ণু যেন জানতে না পারে এখন। শান্তার ইচ্ছে যে একটা ছদ্মনাম সে গ্রহণ করে। সে তো ভাল কথা। লাগসই নাম হলে মামা খুশি হবেন। শান্তা এর মধ্যে নাম ঠিক করে ফেলেছে। কী নাম? চন্দনা? চন্দনাদেবী? —চমৎকার নাম—সত্যিই খাসা নাম। হবে না? কে নামকরণ করেছে দেখতে হবে তো!

শেষপর্যন্ত ঠিক হল শান্তা পরদিন সন্ধ্যা সাতটায় 'উত্তরায়ণ'-এ আসবে কার্তিকবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। দুলাল থাকবে সে সময়ে। বিষ্ণু থাকবে না, কারণ কাল কোন অভিনয় বা রিহার্সাল নেই।

—'কোন ভয় নেই।' আর একবার জানিয়ে দিল দুলাল। 'নমস্কার।' বলে ফোন ছেড়ে দিল।

উত্তেজনার বশে শান্তা হড়বড় করে কত কথা বলে ফেলল দুলালকে। না বললেই পারত। তার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল একটু পরেই। পেশাদার অভিনেত্রী হব বলা সোজা, কিন্তু সত্যি কি সে পারবে দিনের পর দিন নিজের মান বাঁচিয়ে অভিনয় করতে? আর বিষ্ণু, যার জন্যে এতখানি ত্যাগস্বীকার, সে কি বুঝবে এই ত্যাগের মর্ম? যদি ভুল করে ভাবে কাজরীও যা শান্তাও তা? কিংবা যদি রাগ করে 'উত্তরায়ণ' ছেড়ে চলে যায় সে?

শান্তা রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। এখনও সময় আছে। এ যেন সর্বস্ব পণ করে বোকার মত কড়ি খেলা হচ্ছে, চিৎ-কড়ি তোমার জিত উপুড়-কড়ি আমার হার।

সব বুঝেও কিন্তু পরদিন সন্ধ্যার আগেই শান্তা সাজগোজ করে তৈরী হল 'উত্তরায়ণ'-এ যাবার জন্যে। মানুষের যখন বুদ্ধিভ্রংশ হয় তখন এমনই হয়। বুদ্ধির ধারে যা কাটা যায় না দুর্বুদ্ধির ভোঁতা তরোয়ালে তাকেই আগে কাটতে ইচ্ছে করে। ভাবার চেয়ে ভাসাটা সংগত মনে হয়।

বাড়ির গাড়ি শান্তা আজকাল কমই চড়ে। আজকে তো সাহসই

হল না ড্রাইভার মহীপালকে নিয়ে 'উত্তরায়ণ'-এ যেতে—যদি দিদিমা টের পেয়ে যান। রাস্তায় আলো জ্বলতে তাই সে চুপি চুপি সদর দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দিদিমা পেছু ডাকলেন—'কোথায় যাওয়া হচ্ছে দিদিভাই? তাড়াতাড়ি ফিরবে তো?'

'হ্যাঁ।' বলে দায়সারা জবাব দিয়ে শান্তা রাস্তায় নেমে পড়ল। ঐটুকু গলিটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছতে সে হাঁপিয়ে গেল।

এরই মধ্যে এত ঘেমে উঠেছিল সে যে তার মনে হচ্ছিল স্নো-পাউডার গলে গিয়ে মুখে বোধ হয় মেচেতা পড়েছে। হ্যাণ্ড-ব্যাগ বার করে রাস্তার আলোর নীচেই আর একবার তাই প্রসাধনের প্রলেপ বুলিয়ে নিল।

একটা বাস এসে দাঁড়াতে শান্তা এগিয়ে যাচ্ছিল ওঠবার জন্যে। হঠাৎ চমকে উঠল কার গলা পেয়ে— 'নমস্কার।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দুলাল। —'আপনি?'

দুলাল হাত দেখাল একদিকে। বললে, 'ঐ দিকে গাড়ি রেখেছি—আসুন।'

শান্তা কোন কথা না বলে দুলালের সঙ্গ নিল। গাড়ির হুড তুলে দিয়েছে দুলাল। দরজা খুলে দিতে শান্তা পেছনের সিটে বসল। দুলাল ডানদিক দিয়ে উঠে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

গাড়ি চালাতে চালাতে দুলাল বললে, 'আপনাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাবার কথা সাহস করে বলতে পারিনি—পাছে আপনি কিছু মনে করেন। পরে মনে হল আজ আপনি ভয়ংকর একা। তাই ছুটে এলাম।'

—'ধন্যবাদ।' শান্তা সত্যিই বেঁচে গিয়েছিল হুডের নীচে লুকোতে পেরে। সরল ভাবে বলল, 'বন্ধুর মতই কাজ করেছেন আপনি। সত্যি আমি এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম যে ভয় হচ্ছিল বাসে ওঠার আগেই ফেন্ট হয়ে না পড়ে যাই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দুলাল বললে, 'যখন বন্ধু বলে স্বীকার

করলেন তখন আপনাকে ঠকাব না। সত্যি কথা বলি, আপনাকে আমি 'উত্তরায়ণ'-এ ঢোকবার লোভ দেখিয়েছিলাম আমার স্বার্থের জন্যে। আমি চাই বিষ্ণু 'উত্তরায়ণ' ছেড়ে চলে যাক। কাজরীকে আমার মামা জবাব দিয়েছেন এ কথা আমি মিথ্যে করে বলেছিলাম। কাজরী অসুস্থ। সে সেরে উঠলে তার 'উত্তরায়ণ'-এ ফিরে আসার কথা উঠবে। আমি চাই আপনি তার আগে বিষ্ণুকে সরিয়ে নিয়ে যান।'

শান্তা শান্তভাবেই বলল, 'আপনি তো জানেন আমি সেই উদ্দেশ্য নিয়েই উত্তরায়ণ'-এ নাম লেখাতে যাচ্ছি!'

—'জানি বলেই আপনাকে আগে থেকে সাবধান করে দিতে চাই। আপনি কাজরীকেই সরান আর বিষ্ণুকেই সরান আপনাকে অস্ত্রধারণ করতে হবে কাজরীর বিরুদ্ধে। আর সে যুদ্ধ জয় করা খুব সহজ হবে না। তাই আপনাকে আর একবার ভেবে দেখতে বলছি। ইচ্ছে হলে এখনও ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু পরে যদি আপনার জাতও যায় পেটও না ভরে তখন যেন আমায় দোষ দেবেন না।'

শান্তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বললে, 'চুপ করুন। আমার মাথা কেমন করছে।' বলে সে হাতদুটো দিয়ে আধখানা কপাল চেপে ধরল।

'উত্তরায়ণ'-এ পৌঁছে দুলাল শুনল বড়কর্তা এসে গেছেন। শান্তাকে নিয়ে গেল ভেতরে। সাজঘরের ধারে তার নিজের কামরায় বসিয়ে চলে গেল কার্তিকবাবুর ঘরের দিকে।

শান্তা যে আজ আসবে দুলাল তা কার্তিকবাবুকে বলে রাখেনি। দুলাল মেয়েটিকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে শুনে তিনি চটে গেলেন। বললেন, 'আজ আমার সময় নেই—ওকে যেতে বলে দাও।'

দুলাল অনুনয় করে বলল, 'আপনি একবার তার সঙ্গে কথা বলে দেখুন! মেয়েটি বি-এ পাশ—।'

কার্তিকবাবু বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'ও সব পাশ টাশ রেখে দাও।

এটা সরকারী আপিসও নয়, ইস্কুলও নয়। আমি দেখলুম না, পছন্দ করলুম না, আর তুমি আগে থাকতে পাকা কথা দিয়ে বসে রইলে? যত সব—।'

—'না-না, পাকা কথা কিছু দিইনি। ভদ্রঘরের মেয়ে—ওর বাবা নামকরা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। সম্প্রতি ওদের বাড়ির সঙ্গে আমার খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাই আমি ওকে রাজী করাতে পেরেছি।'

কার্তিকবাবু যেন একটু নরম হলেন এবার। শাসনের ভঙ্গীতে বললেন, 'তাহলে ভদ্রপরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুমতি তোমার হয়েছে এতদিনে!' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, 'নিয়ে এস।'

কার্তিকবাবুর ঘরে ঢোকবার সময় শান্তার মনে হতে লাগল যেন তার পা-দুটো কেউ লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। চৌকাঠ পেরিয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে নমস্কার করল দূর থেকে। কার্তিকবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'বসুন।' শান্তা আরও ঘাবড়ে গেল। কার্তিকবাবুর সঙ্গে অনেকখানি তফাত রেখে সে বসতে যাচ্ছিল। তিনি তাঁর টেবিলের সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, 'এইখানে বসুন।'

শান্তা এগিয়ে এসে বসল। দুলাল একটা চেয়ার টেনে এনে তার পাশেই বসে পড়ল।

কার্তিকবাবু এবার জেরা শুরু করলেন।

—'আপনার নাম?'

—'চন্দনাদেবী।'

—'ওটা কি আপনার আসল নাম?'

—'না।'

—'লেখাপড়া কদ্দুর করেছেন?'

—'বি-এ পাশ করেছি—এবার কোন কারণে এম-এ দিতে পারিনি।'

—'আগে কখনও থিয়েটার করেছেন?'

—'হ্যাঁ—স্কুলে, তারপর কলেজে।'

—'ও।' বলে কার্তিকবাবু একটু থামলেন।—'নাচগান জানা আছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আপনার অভিভাবক জানেন যে আপনি আমাদের থিয়েটারে যোগ দিতে চান?'

— 'না। আমার বাড়ির কেউ যাতে জানতে না পারেন সেইজন্যে আমি ছদ্মনাম নিয়েছি। এমন কি স্টেজেও আমি নামতে চাই ছদ্মবেশে।'

কার্তিকবাবু টেবিলের ওপর দুটো কনুইয়ের ভর দিয়ে বসলেন। —'তাহলে তো আপনি মুস্কিলে ফেলবেন দেখছি।'

দুলাল উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'পৌরাণিক নাটক-টাটকে তো ছদ্মবেশেই নামবেন—তবে অন্য নাটকেও চেষ্টা করলে মুখের চেহারা বদলে দেওয়া যেতে পারে।'

কার্তিকবাবু দুলালের দিকে যে ভাবে তাকালেন তার অর্থ হল—তুমি থাম। অতঃপর শান্তার দিকে ফিরে বললেন, 'আমার মনে হয় লুকিয়ে চুরিয়ে, থিয়েটার কেন, কোন কাজই করা উচিত নয়—তার জন্যে অনেক সময়ে অকারণ দণ্ড দিতে হয়, তার ওপর মনে অশান্তি। যাই হোক, আপনি সাবালিকা এ প্রমাণ পেলে আমার বলবার কিছু নেই।'

মামা শান্তাকে নিতে একরকম রাজী হলেন দেখে দুলাল হেসে বলল, 'এঁর মাইনেটা?'

—'দু শ।'

—'দু শ?' দুলাল আরও বেশী আশা করেছিল।

কার্তিকবাবু বললেন, 'ভাল অভিনয় করলে ছ-মাস পরে মাইনে আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়তে পারে।'

দুলাল শান্তার মুখের দিকে তাকাল। মনে হলনা শান্তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে কম মাইনে শুনে। সে তো টাকার লোভে চাকরি করতে আসেনি।

কার্তিকবাবু কিন্তু শান্তাকে ভাববার সময় দিলেন না। বললেন, 'আপনি রাজী থাকেন তো আজই একটা দরখাস্ত লিখে দিয়ে যান।

পরে কণ্ট্র্যাক্ট ফর্ম সই করবার সময় একটা এফিডেভিট বা অন্য কোন প্রমাণ দেবেন আপনার বয়সের আর আসল পরিচয়ের।'

ডুলাল শাস্তার দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনার সব ব্যবস্থা আমি করে দেব—চলুন।'

শাস্তা কার্তিকবাবুকে নমস্কার জানিয়ে উঠে দাঁড়াল।

শাস্তা আর ডুলাল চলে যেতে কার্তিকবাবু মুচকি হেসে সিগারেট ধরালেন। কাজ ছিল না। একটা কাগজের ওপর লাল পেনসিল দিয়ে নকশা কাটতে লাগলেন।

বিষ্ণুর সেদিন আসবার কথা নয়। তবুও তাকে হঠাৎ ঘরে ঢুকতে দেখে কার্তিকবাবু যেন আনন্দের চোটে বেশী খাতির করে ফেললেন।—'আসুন, বিষ্টুবাবু, বসুন।' বলেই ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারা গুণমণিকে দু-পেয়ালা চা আনতে বলে দিলেন।

বিষ্ণু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

—'কাগজে আমাদের বিজ্ঞাপনটা পড়েন নি? কাগজখানা কোথায় গেল? এই যে—।' বলে ড্রয়ার থেকে একটা দলিলের মত পাট করা খবরের কাগজ বার করে বিষ্ণুর দিকে এগিয়ে দিলেন।—'পড়ুন—লাল পেনসিলে যেখানটা দাগ দেওয়া আছে।'

পড়তে পড়তে বিষ্ণুর কপাল কুঁচকে উঠল।

কার্তিকবাবু বললেন, 'বিজ্ঞাপন বেরতে না বেরতে একটি সুন্দরী, বিদুষী, নৃত্যগীতকুশলা নায়িকা এসে হাজির।'

বিষ্ণু বাধা দিয়ে বলল, 'কাজরীকে তাহলে পাকাপাকি ভাবে বরখাস্ত করলেন?'

—'ও, কাজরী?—কেমন আছে আজ? আর জ্বর আসেনি তো?'

বিষ্ণু শ্লেষের হাসি হেসে বলল, 'কাজরীর কথা থাক—আগে আমার কথাটা সেরে নিই। দেড় শ টাকার নায়িকার পাশে এতদিন এক শ টাকার নায়ক ছিলাম। এবার যখন নায়িকার রেট বাড়ল, আশাকরি আমার রেটও সেই সঙ্গে বাড়বে।'

—'বাড়বে বাড়বে। তবে এও জানবেন যে আজ অবধি কোন নায়ককে আমি এক শ টাকার এক আধলা বেশী মাইনে দিই নি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। দেখুন, এই নতুন নায়িকাসম্বন্ধে আপনার কাছে একটা পরামর্শ চাই। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল। কণ্ঠ ভালই মনে হল। বি-এ পাশ। স্বভাবও বেশ নম্র। জানাশুনো সম্ভ্রান্তপরিবারের মেয়ে।'

বিষ্ণু হেসে বলল, 'আপনি ভাল নায়িকা চান, না ভাল পাত্রী চান?'

—'ধরুন, দুটোই। দুলালকে শায়েস্তা করার জন্যে একটি শক্ত মেয়েও অনেকদিন ধরে খুঁজছিলুম। আমার মনে হচ্ছে এ মেয়েটির সে ক্ষমতা আছে। তা নাহলে বুঝছেন না দুলালের মত বাউণ্ডুলে ছেলে ঝুঁকেছে ওর দিকে? ওদের বাড়ির সকলের সঙ্গেও নাকি ভাব জমিয়ে ফেলেছে সে। তবে মেয়েটি তার বাবা-মাকে না জানিয়েই থিয়েটারে ঢুকতে চায়। দুলাল বলছে যে ও তাকে রাজী করিয়েছে, তবে এও হতে পারে যে মেয়েটি নিজেই এখানে আসছে দুলালকে চোখে চোখে রাখতে। কী বলুন?'

বিষ্ণু বললে, 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। সে যাই হোক, আপনার বরাত ভাল 'উত্তরায়ণ'-এর নতুন নায়িকা যোগাড় করতে গিয়ে দুলালের জন্যে সৎপাত্রী পেয়ে গেলেন। আমার বরাত ভাল যে সেই সঙ্গে আমারও মাইনে বাড়ার আশা রইল।'

কার্তিকবাবু বিষ্ণুর কথায় হেসে উঠলেন। বললেন, 'আর একটা কথা আমি ভাবছিলুম যে কাগজে বা প্ল্যাকার্ডে বিজ্ঞাপন দেবার সময় মেয়েটির নামের পাশে বি-এ যোগ করে দেব কিনা! চন্দনাদেবী, বি-এ, ভাল শোনাবে না?'

—'ভাল শোনাবার কথা যদি বলেন তাহলে আমি বলব বিষ্ণু ভট্টাচার্য, বি-এ এ নামটাই বা শুনতে খারাপ কিসে?'

কার্তিকবাবু ভুল সংশোধন করে দিলেন। 'বিষ্ণু নয়, বলুন অভিমন্যু। কিন্তু আসল কথা কি জানেন বিষ্টুবাবু, এখন যা দিনকাল পড়েছে তাতে

যে কোন ব্যবসায় করে খেতে হলে বেশ খানিকটা শো-এর দরকার। তাই মনে করছিলুম যে নামের পেছনে বি-এ, এম-এ এই সব লেজুড় জুড়ে দিলে পাবলিকের চোখে আমাদের থিয়েটারের আভিজাত্য বাড়বে কি না।'

বিষ্ণু কার্তিকবাবুর মতে মত তো দিলই না, উলটে বলল, 'দেখুন মশাই, নায়ক-নায়িকার নামের পাশে ডিগ্রি বসালে থিয়েটারের আভিজাত্য বাড়ে না। আভিজাত্য বাড়ে যদি গ্রীনরুমে মদ্যপান বন্ধ করা যায়, স্ত্রীলোক শিল্পীদের সঙ্গে ইতর ইয়ারকির প্রশ্রয় না দেওয়া যায়, আর থিয়েটারের কর্মচারী ও শিল্পীদের মনে এ বিশ্বাস জাগান যায় যে অসুখ করলে তাদের চাকরি যাবে না।'

কার্তিকবাবুর মেজাজ গরম হয়ে উঠল বিষ্ণুর মন্তব্য শুনে। গলা চড়িয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে কাজরীর কী সম্বন্ধ তা আমি জানতে চাই না, তবে জেনে রাখবেন যে তার সঙ্গে আমারও একটা সম্বন্ধ আছে। তার বিষয়ে কোন কথা আমি আলোচনা করতে চাই না।'

—'ক্ষমা করবেন।' বলে বিষ্ণু চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তবে কি সত্যিই কাজরী স্বাধীন নয়? বিষ্ণুর হঠাৎ একটা বিতৃষ্ণা জন্মাল কাজরীর ওপর। কাজরী তেজের সঙ্গে বলেছিল সে স্বাধীন। বিষ্ণু এক কথায় তাই রাজী হয়েছিল তাকে নতুন জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। নিজের কষ্ট, ক্ষতি কিছুই সে গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু কাজরী যদি পরভৃতা হয়, যদি এত পরিশ্রম, এত শিক্ষাদীক্ষার পুরস্কার লাভ করবার অধিকারই তার না থাকে, তাহলে কী দরকার ছিল বিষ্ণুকে অযথা অনুপ্রাণিত করবার?—তার আদর্শের ওপর হস্তক্ষেপ করবার?

বিষ্ণুর মনে হল এই মুহূর্তে 'উত্তরায়ণ'-এর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সে চলে যায় বাংলা দেশের কোন দূর গাঁয়ে। সেখানে সরল সত্যবাদী বন্ধু সে অনেক পাবে—তাদের কল্যাণসাধন করলে মোটা ভাতকাপড়ের

অভাব তো হবেই না, এমন কি পরকালে স্বর্গের একটা টিকিট তার জন্যে নিশ্চয় বরাদ্দ থাকবে।

সারি সারি ঘরগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বিষ্ণু দাঁড়িয়ে পড়ল। দুলালের ঘরে আলো জ্বলছে। খোলা দরজা দিয়ে বিষ্ণু দেখতে পেল টেবিলের ওপর একটা মেয়েদের হ্যাণ্ড-ব্যাগ পড়ে আছে। বিষ্ণুর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল শান্তার কথা। শান্তারও এই রকম একটা ব্যাগ আছে। ব্যাগটা যারই হোক হারিয়ে যেতে পারে। এই ভেবে বিষ্ণু সেটা তুলে নিল কার্তিকবাবুর কাছে জমা দিয়ে আসবে বলে।

ঘর থেকে বেরতেই পায়ের শব্দ শুনে বিষ্ণু ফিরে তাকাল। দুলাল আর শান্তা এগিয়ে আসছে। বিষ্ণু কশাহতের মত শিউরে উঠল। কার্তিকবাবুর নতুন নায়িকা কে তা বুঝতে তার আর বাকী রইল না।

শান্তা বিষ্ণুর দিকে চাইতে পারল না। মাথা নীচু করল। দুলাল কাছে এসে বললে, 'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই— 'উত্তরায়ণ'-এর নতুন নায়িকা শ্রীমতী চন্দনা দেবী।'

বিষ্ণু ব্যাগটা শান্তার হাতে এক রকম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হন হন করে বাইরে যাবার দরজার দিকে চলে গেল।

কুড়ি

'উত্তরায়ণ' থেকে বেরিয়ে বিষ্ণু ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করে দিল। জনাকীর্ণ পথ যে এত নির্জন হতে পারে তা সে আজ প্রথম আবিষ্কার

করল। লোকারণ্য তার কাছে অরণ্যের মতই নির্বান্ধব, ভয়াবহ বলে মনে হতে লাগল। সামনে প্রশস্ত রাস্তা। তবু যেন তার পালাবার পথ নেই। হিংস্র পশুর মত তাকে তাড়া করছে শান্তা, দুলাল, কাজরী, কার্তিকবাবু, তার বাবা।

যে শত্রুকে যুদ্ধে হারান যাবেনা, তার কাছ থেকে যে পালায় সেই বাঁচে। ছুটে পালাতে না পারলে লুকিয়ে পালানও বাহাদুরি। যেন তাই ভেবে বিষ্ণু যেতে যেতে একটা পানের দোকান দেখতে পেয়ে তার লাগোয়া গলিতে ঢুকে পড়ল। এ গলিটা তার চেনা। এই গলির মধ্যেই সেই কদর্য বস্তি যেখানে কলেরা রোগীদের শুশ্রূষা করতে করতে কাজরীর অসুখের জন্যে কাজ বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।

ঝোঁকের মাথায় গলিটাতে ঢুকে পড়ে বিষ্ণুর মনে হল সে ভালই করেছে। কারণ যে গলিতে দেশী মদের দোকান ও সন্দেহজনক চরিত্রের নরনারীর বাস তার একটা গুণ হল এই যে সেখানে সূক্ষ্ম চিন্তা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়না—যেমন মন্দিরের মধ্যে গো-চর্ম। এ রকম গলির আবহাওয়ার মধ্যে এমন একটা স্থূল অনুভূতি সর্বদা বিরাজ করে যার আভাস পেয়েই সূক্ষ্ম অনুভূতি লম্বা পা ফেলে সরে পড়ে।

এই সব ভাবতে ভাবতে বিষ্ণু যখন বস্তির মুখে এসে পৌঁছল তখন তার মস্তিষ্কের যন্ত্রণা অনেক কমে গেছে। তার ক্ষতস্থানে যেন কোন এ্যানেস্থেটিক লাগান হয়েছে—এখন অস্ত্রোপচার করলে সে টেরও পাবে না। বস্তির ভেতর দু-একজন মাতালকে ঢুকতে দেখে বিষ্ণুর মনে হল—এই অবশতা আনবার জন্যে কি নেশার সৃষ্টি? বিষ্ণু পকেটে হাত দিয়ে দেখল তার কাছে কত পয়সা আছে। হ্যাঁ, যা আছে তা মাতাল হবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তার ভয় হল যদি নেশা কেটে যাবার পর আবার নতুন করে যন্ত্রণা শুরু হয়?

হঠাৎ কাঁধে কে হাত দিল। বিষ্ণু চমকে উঠে ফিরে তাকাল।

—'এই যে বিষ্টুবাবু, চিনতে পারছেন?' বিষ্ণু চিনতে পারল না।

—'আপনিই তো কিছুদিন আগে একদল ছেলেমেয়ে সঙ্গে করে এসেছিলেন আমাদের কলেরার হাত থেকে বাঁচাতে।'

—'হ্যাঁ।' বলেই বিষ্ণুর ভয় হল লোকটি না বলে মৃত্যুরূপী ভল্লুককে দেখে বিষ্ণু আর অন্যান্য কপট বন্ধুরা যে সরে পড়েছিল বস্তির সকলে তা বুঝতে পেরেছে। বিষ্ণু তাই ইতস্ততঃ করে বলল, 'আমাদের দলের যিনি নেত্রী, তাঁর হঠাৎ গুরুতর অসুখ হয়ে পড়ায় আমরা কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম।'

লোকটি বললে, 'তাহলেও আপনারা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন—এ ঋণ আমরা কোনদিন ভুলব না।'

বিষ্ণু আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'আমরা চলে যাবার পর আর কেউ মারা যায়নি তো ?'

—'ভগবানের কৃপাই বলুন আর অকৃপাই বলুন, আর কেউ বস্তির মায়া ছেড়ে যেতে পারেনি। সে যাক, এতদিন পরে যখন পায়ের ধুলো দিলেন একবার দয়া করে আমার বাড়িটা দেখে আসবেন চলুন।'

বিষ্ণু এড়াবার চেষ্টা করেও পারল না। লোকটি নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুকে যেতে হল।

চলতে চলতে লোকটি বললে, 'বাড়ি বলতে বস্তির একখানা ঘর—তার মধ্যে স্ত্রীপুত্র নিয়ে মাথা গুঁজে থাকি। কিন্তু আমার একদিন বাড়ি-ঘর সবই ছিল।'

—'তাই নাকি ?' বিষ্ণুর দুঃখ হল।

—হ্যাঁ। একদিন ভদ্রলোক ছিলাম সে কথা প্রায় ভুলতে বসেছি। তবু বাইরের কোন ভদ্রলোককে দেখলে গায়ে পড়ে কথা না বলেও থাকতে পারিনা।'

বলতে বলতে লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ল টিনের চাল দেওয়া কয়েকখানি ঘরের সামনে। শেষ ঘরখানার দিকে হাত দেখিয়ে বলল, 'এই আমার বাড়ি। একে কুঁড়েঘরই বলুন আর রাজপ্রাসাদই বলুন আমার কিছু যায় আসে না। আসুন—।' বলে লোকটি এগিয়ে গিয়ে চটের পর্দা তুলে

বিষ্ণুকে ভেতরে যাবার জন্যে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। বাধ্য হয়ে বিষ্ণু ভেতরে গেল। পুরো ঘরখানা কত বড় তা বোঝা গেলনা। তবে জোড়াতালি দেওয়া চট দিয়ে প্রায় সবটাই আড়াল করা আছে দেখে বিষ্ণু খানিকটা আশ্বস্ত হল। লোকটি দেয়ালের পাশ থেকে একটা ভাঙ্গা ফোল্ডিং চেয়ার আনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে এগোচ্ছিল। বিষ্ণু আপত্তি করল।— 'চেয়ার কী হবে ?' বলে সে মাটিতে ছেঁড়া মাদুরের ওপরেই বসে পড়ল।

লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'মাটিতেই বসলেন ?'

সেও মাদুরের একধারে বসল। বিষ্ণু কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তার নিজের ইতিহাস গড়গড় করে বলে গেল—'আমার আসল নাম অবিনাশ মৈত্র। আমার বাবা তেলকলের ম্যানেজার ছিলেন। লেখাপড়া শিখিয়ে আমাদের মানুষ করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। হঠাৎ তিনি যখন মারা গেলেন আমাদের সংসার যেন অকূল সমুদ্রে ভেসে গেল। সামনে যা পেলুম আমি তাই আঁকড়ে ধরলুম। আমার এক পিসের ঘড়ির দোকানে ঢুকে পড়লুম ঘড়ি মেরামতের কাজ শিখতে। আমার পদবী মৈত্র থেকে মিস্ত্রী হয়ে গেল।'

লোকটি একটু থেমে আবার বলতে লাগল— 'তাও ভায়ে ভায়ে যতদিন সদ্ভাব ছিল এক রকম চলে যাচ্ছিল। মার কান্নাকাটির ঠেলায় বিয়েও করে বসলুম। কিন্তু পয়সা যার নেই চিরদিন তাকে কে পুষবে ? হলই বা নিজের ভাই ? একদিন স্পষ্ট বলল রাস্তা দেখতে। বাধ্য হয়ে আলাদা করে সংসার পাততে হল। যা আয় তাতে ব্যয় কুলোয় না। রোজগার বাড়ানর জন্যে অনেক কিছু করলুম—খবরের কাগজ বেচা, চা বেচা, ফুটপাথে বসে ভাগ্য গণনা। শেষে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে একটা ভাল লাইন ধরেছি।'

বিষ্ণু জিজ্ঞেস করল 'কী ?' আরও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

অবিনাশ বিষ্ণুর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললে, 'ঘোড়ার ঠিকুজী বিচার করা। এখন হপ্তায় হপ্তায় যা লাগাই তার দশগুণ বিশগুণ ফিরে আসে।'

বিষ্ণু হাসল।

অবিনাশ বলে যেতে লাগল, 'তাও কি ছাই ধীরেসুস্থে মাথা ঠাণ্ডা করে সব কষে দেখবার উপায় আছে? একে তো সংসারে চ্যাঁ-ভ্যাঁ লেগেই আছে, তার ওপর আমার পাশের ঘরে এক মিঞা সাহেব তাঁর মেয়েকে বাঈজী তৈরি করবার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা তালিম দিচ্ছেন। কান ঝালাপালা হয়ে গেল মশাই। হিসেবের কথা ছেড়েই দিন, ঘুমেরও দফারফা হয়ে যায় এক একদিন।'

বিষ্ণু অবিনাশের আত্মকাহিনী শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। এবার বললে, 'আমি এখন উঠি।'

অবিনাশ দুঃখ পেল।—'সে কি হয়? গরিবের বাড়ি কিছু না খেয়েই চলে যাবেন? অন্ততঃ এক পেয়ালা চা খেয়ে যান।' বলেই সে অন্দরের দিকে মুখ করে বলল, 'ওরে বুড়ি, মাকে বল একটু চা করতে।'

বিষ্ণু বললে, 'থাক থাক, চা করতে হবে না। আমি বেশী চা খাই না।'

—'তবে কী খান? পান, সিগারেট? অন্য কোন নেশা?'

বিষ্ণু হেসে বলল, 'না। অন্য কোন নেশা নেই।'

অবিনাশ ছাড়বে না। সে ভেতরে চলে গেল।

বিষ্ণু বসে বসে ভাবতে লাগল অবিনাশের ছেলেমেয়েদের চরিত্রগঠনের কথা। ময়রার মত তাদের কি সন্দেশের ওপর বিদ্বেষ জন্মাবে? বিষে বিষক্ষয়? ভোগে না হোক ভোগদর্শনে নিবৃত্তি?

এমন সময় পাশের ঘর থেকে একটা সস্তা হারমোনিয়মে সস্তা সুর বেজে উঠল। বিষ্ণু বুঝতে পারল এইবারে মিঞা সাহেবের মেয়ের তালিম শুরু হল। হ্যাঁ, তাই। একটু পরেই শোনা যেতে লাগল একটি মিষ্টি গলাকে সাধাবার জন্যে একটি কর্কশ গলার নিষ্ঠুর কালোয়াতি।

খানিক পরেই অবিনাশ চটের পর্দার ফাঁক দিয়ে ফিরে এল। একটি রেকাবে করে সে বিষ্ণুর জন্যে দুটি পান ও চুন-সুপুরি এনেছে। বললে, 'আমার বাড়ির সাজা দুটো পানও অন্ততঃ খেয়ে যান।'

বাধ্য হয়ে বিষ্ণু পান দুটো মুখে পুরল। পান সে কমই খায় বলে তার ভাল লাগল পানদুটো চিবোতে। মনে হল অবিনাশের গৃহিণীর পান সাজার হাত আছে। বিষ্ণু উঠে পড়ল। অবিনাশ তাকে রাস্তা অবধি এগিয়ে দিতে গেল। বিদায় দেবার সময় কৃতার্থ হয়ে বললে, 'এদিকে এলে আবার পায়ের ধুলো দেবেন।'

অবিনাশের ব্যক্তিগত চরিত্র খুব মহৎ না হলেও বিষ্ণুর মনে হল ভালয়মন্দয় মিশিয়ে লোকটা সৎ। 'ঊষা-সংঘ'-এর কথা মনে জাগতে বিষ্ণু ভাবল ভবিষ্যতে এ বস্তিতে আবার কাজ শুরু করবার সময় অবিনাশকে হয়ত কাজে লাগান যেতে পারে।

সেদিন বাড়ি ফিরে বিষ্ণু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল। সকালে উঠে দেখল শান্তা আর কাজরীর ওপর তার রাগ অনেকটা পড়ে গেছে। তাছাড়া, বিষ্ণু ভাবল, 'উত্তরায়ণ'-এ যোগ দিয়ে আর 'ঊষা-সংঘ' গঠন করে তার যে আদর্শগুলোকে সে বাস্তবে পরিণত করতে চলেছে শান্তা আর কাজরীর ওপর অভিমান করে সে আদর্শগুলোকে হত্যা করার অধিকার তার নেই। তবু শান্তা আর কাজরীর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার একেবারে। সন্ধ্যাবেলা 'উত্তরায়ণ' থেকে বেরিয়ে সে তাই নিঃসঙ্গ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে কী মনে করে অবিনাশদের বস্তির দিকেই রওনা হল।

অবিনাশ তার ঘরের সামনে ফোল্ডিং চেয়ার পেতে পাশের ঘরের আলোর সাহায্যে এক মনে রেসের বই পড়ছিল। বিষ্ণু তার সামনে এসে দাঁড়াতে সে চমকে উঠল। ঘাড় তুলে বিষ্ণুকে দেখে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'আপনি? —আসুন, আসুন। এই চেয়ারটাতেই আপনি বসুন, আমি আর একটা কিছু নিয়ে আসছি।' বলে অবিনাশ ঘর থেকে একটা ভাঙ্গা প্যাকিং বাক্স এনে চেয়ারের পাশে রাখল।

অবিনাশের হাতে রেসের বইটা লক্ষ করে বিষ্ণু বললে, 'এমনিতেই তো তোমার চোখ খারাপ—ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের মত পুরু চশমা—এর ওপর এত অল্প আলোতে বই পড়লে চোখের কি আর কিছু থাকবে?'

—'কী করি বলুন? ঘরে বসে বই পড়লে তেলের খরচা তো আছেই। উপরন্তু এক ফোঁটা বাতাসের জন্যে খাবি খেতে হয়। তার চেয়ে এ জায়গাটা শতগুণে ভাল—বিনি পয়সায় আলো-হাওয়া দুটোই পাওয়া যায়।' বলে অবিনাশ হাসতে লাগল।

এ-কথা সে-কথার পর বিষ্ণু 'ঊষা-সংঘ'-এর কথা তুলতে অবিনাশ খুবই উৎসাহ দেখাল এবং বললে যে তার দ্বারা যতটুকু সম্ভব সে তা প্রাণ দিয়ে করবে—শুধু কী করতে হবে এইটুকু বলবার যা অপেক্ষা।

কিছুক্ষণ পরে বিষ্ণু উঠতে যাচ্ছিল। অবিনাশ বললে, 'দাঁড়ান। আপনার জন্যে পান নিয়ে আসি। আপনি তো গরিবের বাড়ি আর কিছু খাবেন না!'

বিষ্ণু লজ্জিত হয়ে বলল, 'না-না, রোজ রোজ আবার পান কেন?' অবিনাশের দুরবস্থা দেখে তার দুটো পানের খরচা বাড়াতেও বিষ্ণুর বিবেকে বাধছিল।

অবিনাশ শুনল না। বিষ্ণুকে পান খেতে হল। অবিনাশ বুঝতে পেরেছিল বিষ্ণুর মনের কথা। বললে, 'আপনার হয়ত মনে হচ্ছে গরিবের দুটো পান খেয়ে তার ক্ষতি করলুম, কিন্তু গরিবের মনে এতে যে কত আনন্দ হয় আপনি তা বুঝবেন না।'

ধরা পড়ে গিয়ে বিষ্ণু চুপ করে রইল। মনে মনে ঠিক করল এবার যেদিন অবিনাশের সঙ্গে দেখা করতে আসবে খালি হাতে সে আসবেন না।

কাজরীর ওপর অভিমানটা দেখাবার জন্যে বিষ্ণু পণ করেছিল অন্ততঃ সাতদিন তার বাড়িতে সে যাবে না। অবিনাশের সঙ্গে আলাপ হয়ে সে

দিক দিয়ে বিষ্ণুর সুবিধেই হল। শুধু সময় কাটান নয়, এ ধরনের অভিজ্ঞতাও আবার চট করে অর্জন করা যায় না।

এই কদিনে বস্তির অনেকের সঙ্গেই বিষ্ণুর পরিচয় হয়ে গেল অবিনাশের আস্তানায়। সকলেই অবাক হল এই ভেবে যে বিষ্ণুর মত একজন ভদ্রসন্তান অবিনাশের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কী আনন্দ পায়? তার কোন নেশা নেই, বদখেয়াল নেই, রেস খেলে বড় লোক হবার আকাঙ্ক্ষাও নেই, মিত্রা সাহেবের মেয়ের রূপে বা গুণে সে মজেছে তাও মনে হয়না। তবে সে রোজ সন্ধ্যাবেলা অবিনাশের ঘরের সামনে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে কী সম্পদ সঞ্চয় করে?

একদিন ফোল্ডিং চেয়ারখানা উলটে বিষ্ণু হঠাৎ পড়ে গেল। জায়গাটা এবড়ো খেবড়ো—দু-চারটে ইঁট-পাথরও ছিল জমিতে। বিষ্ণুর হাতে পায়ে চোট লেগে দু-এক জায়গায় ছড়ে গেল, আর সেই সঙ্গে তার হাতঘড়িটাও বন্ধ হয়ে গেল। অবিনাশ প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, 'ঘড়ির জন্যে আপনি ভাববেন না, আমি ভাল করে সারিয়ে দেব—কিন্তু আমার দোষে আপনি পড়ে গিয়ে চোট খেলেন এর জন্যে আজ হয়ত আমার ঘুমই হবে না।'

বিষ্ণু হেসে বললে, 'কী যে পাগলের মত বকছ! আমার কি হাত-পা ভেঙ্গেছে না মাথা ফেটেছে যে তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ?'

অবিনাশ মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'হাত-পা বেশ ছড়ে গেছে—ঘরে ওষুধপত্তরও কিছু নেই যে আপনাকে দিই। মিত্রা সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে আনব?'

—'না—না, তুমি ভেবনা। কিচ্ছু হয়নি, কালকেই সেরে যাবে।' বিষ্ণু বাড়ি যাবার জন্যে পা বাড়াল।

অবিনাশ ছাড়ল না। বললে, 'অন্ততঃ ঘড়িটা রেখে যান। আমি দু-দিনে সারিয়ে তিন দিনের দিন আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

বিষ্ণু ইতস্ততঃ করছিল ঘড়িটা হাতছাড়া করতে। অবিনাশ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে একটা রসিদের বই এনে ঘড়িটা বিষ্ণুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে

রসিদ লিখতে লাগল। রসিদ বইয়ের সঙ্গে টিকিবাঁধা ছোট্ট কপিং পেনসিলটা দুবার জিভে ঠেকিয়ে খুঁটিয়ে লিখল ঘড়ির বর্ণনা। সেই সঙ্গে বিষ্ণুর নামঠিকানাও লিখে রাখল। রসিদখানা এক টানে ছিঁড়ে বিষ্ণুর হাতে দিয়ে বলল, 'কোন ভয় নেই আপনার—অবিনাশ মিস্ত্রী যে ঘড়ি সারায় সে ঘড়িতে দশ বছর আর হাত দিতে হয় না।'

অবিনাশকে বিশ্বাস করতেই হল। তবুও বিষ্ণুর মনটা যেন খচ খচ করতে লাগল। লালহাটির জমিদারমশাই ঘড়িটা উপহার দিয়েছিলেন তার বৃত্তি পেয়ে মাট্রিক পাশ করার সময়।

ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলোতে সঙ্গে সঙ্গে কোন ওষুধ না লাগান যে অন্যায় হয়েছিল বিষ্ণু তা বাড়ি গিয়েই বুঝতে পারল। গা হাত পা টাটিয়ে রাত্তিরে জ্বর এল। বিষ্ণু দুদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারল না। ডাক্তার ডাকার দরকার হবে না মনে করে বিষ্ণু তৃতীয় দিন সকালে জোর করে বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছিল। এমন সময় অবিনাশ এল। দুঃখের সঙ্গে জানাল যে ঘড়িটা সারাতে একটু সময় লাগবে, তাই সে অন্য ঘড়ি না পেয়ে বিষ্ণুর ব্যবহারের জন্যে একটা টাইম-পিস নিয়ে এসেছে। টাইম-পিসটা নতুন ধরনের—একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসান—দেখতে পরিষ্কার।

বিষ্ণু বললে, 'আবার এটা আনবার দরকার কী ছিল ?'

অবিনাশের সঙ্কোচের অবধি ছিল না। বললে, 'আপনার বড় মন তাই আপনি ও কথা বললেন; কিন্তু দেখুন তো আমি আপনাকে কী বিপদেই ফেলেছি—একে তো ঘড়িটা খারাপ হয়ে গেল, তার ওপর এই জ্বরজারি।' বলে অবিনাশ দেখেশুনে তাকের ওপর টাইম-পিসটা এমনভাবে সাজিয়ে রাখল যাতে পাঁচজন দেখে তারিফ করে।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় হঠাৎ কাজরী এসে হাজির। তার চেহারা এখনও রুগ্ন। মুখ ফ্যাকাশে।

বিষ্ণু শুয়েছিল। আবার তার জ্বর এসেছে বিকেল থেকে। কাজরী বসে পড়ল বিষ্ণুর বিছানার সামনে। কথা বলবার আগেই সে হাঁপাতে লাগল।

বিষ্ণু ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে,' তোমার নিজের শরীরই এখনও সারেনি। তুমি আবার কষ্ট করে এতটা পথ এলে কেন ?'

—'আমার কষ্টের কথা জানাতে আমি আসিনি।'

কাজরীকে চুপ করতে হল। বেশী কথা একসঙ্গে সে বলতে পারছিল না।

বিষ্ণুর মায়া হতে লাগল কাজরীকে দেখে। বললে, 'তোমার ওখানে আমি ইচ্ছে করেই কদিন যাইনি। অবশ্য তার কোন কারণ আছে। ভেবেছিলাম তুমি সেরে উঠলে তোমায় কারণটা জানাব।'

—'তার আর দরকার নেই। দুলালবাবু একদিন এসে আমায় সবকিছু বলে গেছেন।'

—'দুলাল ? কি বলেছে সে ?'

—'বলেছেন যে আমি যা ফেলে দিতে চেয়েছিলাম আমায় না জানিয়ে তুমি তা শান্তাকে দিয়েছ। তুমি আমায় যেখান থেকে হাত ধরে তুলে এনেছ, সেইখানেই নামিয়েছ শান্তাকে। জানিনা এই তোমাদের ভদ্রসমাজের ভালবাসা কি না! কিন্তু তোমার ওপর আর আমার কোন শ্রদ্ধা নেই।'

—'মিথ্যে কথা—দুলাল মিথ্যে কথা বলেছে।' বিষ্ণু উত্তেজিত হয়ে উঠল।—'এ সব দুলালের কারসাজি। শান্তা আমায় অবিশ্বাস করে দুলালকে বিশ্বাস করেছে—আর তুমিও তাই।'

বিষ্ণু চুপ করে গেল। মাথার নীচে হাত দুখানা ভাঁজ করে শুয়ে রইল ওপর দিকে চেয়ে।

কাজরী গম্ভীর হয়ে বলল, 'যদি শান্তা ভুলও করে থাকে, আমি বলব তার জন্যে তুমি দায়ী।'

বিষ্ণু রেগে গিয়েছিল। কার্তিকবাবুর সঙ্গে কাজরীর সম্বন্ধ নিয়ে

এই সুযোগে একটা খোঁটা দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। বললে, 'যাই হোক, এতক্ষণে তোমার বোঝা উচিত যে এ কদিন তোমার বাড়িতে আমার না যাওয়ার কারণ শান্তা নয়—আর একজন কেউ।'

—'জানি। তোমার সব খবর আমি রাখি। এ কদিন রোজ সন্ধ্যেবেলা তুমি অবিনাশ মিস্ত্রীর বাড়ি যেতে—আফিং খেতে।'

—'আফিং খেতে ?' বিষ্ণু আকাশ থেকে পড়ল।

—'তা ছাড়া তো আর কোন কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছিনা। যদি অন্য কোন কারণ থাকে তা তুমিই জান।'

—'কিন্তু আফিং খাওয়ার কথাটা উঠল কেন ?'

—'কারণ, অবিনাশ লুকিয়ে আফিং‌এর ব্যবসা করে জানতে পেরে পুলিস তাকে ধরে নিয়ে গেছে। তার ঘড়ির দোকান সার্চ করে পুলিস জানতে পেরেছে যে ঘড়ির মধ্যে অবিনাশ আফিং লুকিয়ে রাখত।'

—'ঘড়ির মধ্যে ?' বিষ্ণু ভয়ে ভয়ে তাকের ওপর অবিনাশের দেওয়া টাইম-পিসটার দিকে তাকাল। তবে কি ওর মধ্যেও আফিং পুরে অবিনাশ ঘড়িটা তার জিম্মায় দিয়ে গেছে ঐ কারণে ? তবে কি পানের সঙ্গে অবিনাশ আফিং খাওয়াত বলে রোজ সন্ধ্যাবেলা বিষ্ণু ছটফট করত অবিনাশের বাড়ির সাজা পান খাবার জন্যে ?

বিষ্ণু কাজরীকে খুলে বলল সব কথা। শুনে কাজরী বললে, 'অবিনাশের মত একটা অমানুষকে চিনতে পারনা, আর তুমি চাও মানুষ চিনতে ? আজই আমি দলের ছেলেদের খবর দিচ্ছি আর কিরণবাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার চিকিৎসার জন্যে। তোমার এ অসুখ আফিং‌এর বিষ থেকেই হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। আর অবিনাশের ঐ ঘড়িটাও আমি নিয়ে চললুম। অবিনাশের কৃপায় পুলিস তোমার বাড়ি অবধি ধাওয়া করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

কাজরীর আগমন ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিষ্ণুকে যে কতবড় বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিল তা পরদিনই জানা গেল। ভোর না হতেই পুলিস এসে বিষ্ণুর বাড়ি ঘেরাও করে খানাতল্লাশ শুরু করে দিল। অবশ্য কিছু না পেয়ে এবং বিষ্ণুকে শয্যাশায়ী দেখে তারা চলে গেল—তারপর বিষ্ণুকে আর বিরক্ত করেনি।

পাড়ায় রটে গেল বিষ্ণু বাড়িতে বোমা তৈরি করতে গিয়ে হাত-পা পুড়িয়েছে এবং দু-একদিনের মধ্যে তাকে ঘরের পাট তুলে দিয়ে শ্রীঘরে গিয়ে বাস করতে হবে।

গোপীকান্তবাবু খবর শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বিষ্ণু তাঁকে আশ্বস্ত করে বলল যে একটা দোকানে সে ঘড়ি সারাতে দিয়েছিল—সেই দোকানের মালিক লুকিয়ে আফিং বিক্রি করার অপরাধে ধরা পড়ায়, পুলিস দোকানে বিষ্ণুর ঠিকানা পেয়ে এসেছিল দেখতে যে বিষ্ণু সত্যিই ঘড়ি সারাতে দিয়েছিল না সেও আফিংএর ব্যবসার একজন অংশীদার।

গোপীকান্তবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আগে জানলে আমিই তার কাছ থেকে খানিকটা আফিং কিনে নিতুম। আফিংএর ব্যবসায় কম লাভ মনে করেছেন? একটা বছর ভালয় ভালয় উতরে গেলে সারাজীবনের হিল্লে হয়ে যায়।'

বিষ্ণুর অসুখ আর সেই সঙ্গে তার বাড়িতে খানাতল্লাশ হওয়ার খবর পেয়ে কার্তিকবাবু একদিন এলেন দেখা করতে। শান্তাও এসেছিল আর একদিন সকালবেলা। বিষ্ণু বিশেষ কোন কথা বলল না। জিজ্ঞেস করল না কেন সে 'উত্তরায়ণ'-এ যোগ দিল।

শান্তার অসহ্য লাগল বিষ্ণুর এই অনাসক্ত ভাব। তার মনে হল অপরাধী বিষ্ণু অপরাধ স্বীকার করার কর্তব্য এড়িয়ে যাচ্ছে।

কমলাদির কাছে একদিন কথাটা পাড়তে তিনি বললেন, 'আমি মনে করিনা বিষ্ণু দোষী। আমি এও মনে করিনা যে সে চরিত্রহীন।'

—'কিন্তু তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেছে।'

—'চাক্ষুষ প্রমাণ নির্ভর করে যে চোখ দিয়ে দেখা যায় তার ওপর।'

—'আপনি কি তবে বলতে চান যে কাজরীর ওপর বিষ্ণুর কোন টান নেই ?'

—'টান থাকতে পারে কিন্তু দাবি নেই।'

—'কি করে বুঝলেন ?'

—'দাবি থাকলে সেও কাজরীর সঙ্গে 'উত্তরায়ণ' ছেড়ে চলে যেত।'

একুশ

সুস্থ হবার পর কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যেও বিষ্ণুকে কাজরীর বাড়ি যেতে হল। বিষ্ণু গিয়ে দেখল দলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজরী রীতিমত সংসার পেতে বসেছে।

ঊষাদিকে এই কদিনে আপনার করে পেলেও ঊষাদির ব্যক্তিগত জীবনের কোন হদিসই তারা পায়নি। এইটুকু জেনেছে যে ঊষাদির কেউ নেই। একদিন তিনি অভিনেত্রী ছিলেন এখন 'ঊষাসংঘ'-এর কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। বিষ্টুদার সঙ্গে ঊষাদির কী সম্বন্ধ তা নিয়েও মাথা ঘামাতে ছাড়েনি তারা। কেউ কেউ ভেবেছিল ভবিষ্যতে বিষ্টুদার সঙ্গে ঊষাদির বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। আবার কেউ তর্ক করেছিল যে বিষ্টুদার মনে তেমন কোন দুর্বলতা থাকলে দলের মধ্যে ছেলে ও মেয়ে দুই-ই নিতেন না তিনি।

সে যাই হোক বিষ্ণু ফিরে আসতে দলের সেবক-সেবিকারা নতুন কর্মক্ষেত্র দাবি করল। বিষ্ণু ভেবেচিন্তে বলল, 'তোমাদের ঊষাদির যে

রকম শারীরিক অবস্থা তাতে বেশ কিছুদিন ওর বিশ্রাম নেওয়া উচিত। তবে বেশীদিন হয়ত ও চুপচাপ বসে থাকতে পারবে না। তাই আমি ভাবছি ওকে নিয়ে তোমরা বাইরে কোথাও চলে যেতে পার কিনা। অবশ্য আমি বুঝতে পারছি তোমাদের সকলের পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব হবে না—আর বাইরে যাওয়ার যা খরচা তা আমাদের কষ্ট করেই যোগাড় করতে হবে—তবু আমি বলব, গ্রামে গ্রামে গিয়ে সংঘের কাজ করা আর সংঘের আদর্শ গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের একটা প্রধান কাজ। তাই আমি বলি কি কোন একটা গ্রামকে কেন্দ্র করে সংঘের নতুন কাজ শুরু করা যাক। তারপর যদি গ্রামবাসীদের মন জয় করা সম্ভবপর হয় তখন অর্থবল বা লোকবলের অভাব আপনা থেকেই দূর হয়ে যাবে।'

কেউ কেউ এ কাজে নামতে পারবে না বলে দুঃখিত হলেও সকলে বিষ্টুদার পরিকল্পনা এক বাক্যে সমর্থন করল। জয়া বলে একটি মেয়ে বলল যে তাদের দেশের মত স্বাস্থ্যকর জায়গা বাংলাদেশে নেই এবং তাদের দেশের বাড়িতে থাকবারও কোন অসুবিধে হবে না। বিষ্টুদা যদি রাজী হয় সে আজই বাড়ি গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারে।

বিষ্ণু বললে, 'তোমার কথাই থাকবে। তোমাদের দেশকে কেন্দ্র করেই কাজ আরম্ভ করা হবে। কিন্তু আমরা চেষ্টা করব স্বাবলম্বী হতে। তাই দলের সকলের থাকবার আর কোন জায়গা আমাদের খুঁজে নিতে হবে। ধর কোন ভাঙ্গাচোরা কুঁড়েঘর যদি আমরা পাই, আমরাই সেটাকে সারিয়েসুরিয়ে নিলুম সাধ্যমত—কী বল? তাতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

জয়া ঘাড় নেড়ে বলল, 'না।'

কাজরীর অতীত জীবন নিয়ে পাছে গৃহস্থের গৃহে অশান্তির সৃষ্টি হয় এজন্যেও বিষ্ণু জয়াদের দেশের বাড়িতে ওঠার কথাটা এড়িয়ে গেল।

অতঃপর শুভদিন দেখে 'ঊষা-সংঘ'-এর সেবক-সেবিকারা কাজরীকে নিয়ে রওনা হল জয়াদের দেশে কাজ শুরু করার জন্যে। স্টেশনে জয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি যাবেন না?'

বিষ্ণু হেসে বলল, 'দরকার পড়লে নিশ্চয় যাব। আপাততঃ ঊষা, মণিদি, অনিল তোমাদের দেখাশুনো করবে। পরে তোমরাই এক একজন নেতা ও নেত্রী হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের দল শতদলের মত বঙ্গদেবীর পদাসন হয়ে সারা দেশকে অনুপ্রাণিত করবে।'

সেদিন যে বিষ্ণুর মন ভাল থাকবে না এ খুবই স্বাভাবিক। কাজরী নেই, হাতে কোন কাজও নেই। অবিনাশটা চোরাকারবার করে সর্বনাশ করল। তা না হলে নোংরা বস্তিতে অবিনাশের ফোল্ডিং চেয়ারে বসে মাঝে মাঝে সময় নষ্ট করার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য ছিল। শান্তার সঙ্গে বাক্যালাপ এক রকম বন্ধ বললেই হয়। বিষ্ণু হঠাৎ নারকোলপিসিকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'চল তীর্থ করে আসি।'

নারকোলপিসি ভকচকিয়ে গেলেন। এমনিতেই কিছুকাল বিষ্ণুর হালচাল দেখে, আর সম্প্রতি বাড়িতে পুলিসের হাঙ্গামা হওয়ায় তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে বিষ্ণুর বাড়িতে তিনি নিরাপদে আছেন কি নেই। এর ওপর তীর্থযাত্রার মত বিপজ্জনক কাজে উৎসাহ দেখাবার মত মনের জোর তাঁর ছিল না। অসহায় ভাবে বললেন, 'তুই বাপু একটা বিয়ে কর। আমি তোকে শাসনও করতে পারিনা, সামলাতেও পারি না। তোর বৌ এলে তারপর আমায় না হয় কাশী পাঠিয়ে দিস।'

বিষ্ণু হেসে উড়িয়ে দিল পিসিমার অনুযোগ। ভাবল সেই বা অসহায় কম কিসে? বাড়ি ছেড়ে আসার পর থেকে আজও তো সে ভেসেই চলেছে—'উত্তরায়ণ'-এ কদিন সে টিঁকে থাকবে, 'ঊষা-সংঘ' কদিন টিঁকবে, কিছুরই স্থিরতা নেই।

পুলিস বিষ্ণুর বাড়িতে হানা দিয়ে তার একটা মস্ত ক্ষতি করে গেল। পাড়ার অধিকাংশ ছেলেমেয়ের বাপ-মা তাদের বিষ্টুদার বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। বিষ্ণুর তুটি বন্ধু শুধু টিঁকে রইল—ভগবানের ছেলে খুশী, আর গোপীকান্তবাবুর ছেলে ভণ্টু।

এতগুলো ছেলেমেয়ের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে নারকোলপিসির রূপও বদলে গেল। মনে হল তাঁর আগেকার রাগ যেন লোক দেখান। এখন খুশী আর ভণ্টু যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায় সে জন্যে নারকোলপিসির ভাবনার অন্ত রইলনা। ভাঁড়ারঘরে ফাঁদ তো পাতলেনই, তার ওপর 'আরব্য-উপন্যাস'-এর রচয়িত্রীর মত রোজ একটা গল্প বলে ছেলেতুটির নেশার খোরাক তিনি যুগিয়ে যেতে লাগলেন দিনের পর দিন। এর ফলে অকৃতজ্ঞ খুশী আর ভণ্টু বিষ্টুদাকে ফেলে পিসিমার ঘরে অস্তানা গাড়ল কেন সে প্রশ্ন না করাই উচিত।

বাইশ

শান্তাকে নায়িকা করে কার্তিকবাবু প্রথম যে বই মঞ্চস্থ করালেন, সে বই বেশীদিন চলল না। তার জন্যে বিষ্ণুকেই কার্তিকবাবু দায়ী করলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে কাজরীর সঙ্গে বিষ্ণু যেমন সহজ অভিনয় করত, শান্তার সঙ্গে তেমন করছে না। কোথায় সে স্বাচ্ছন্দ্য?—সে রসজ্ঞতা? বিষ্ণুকে ডেকে একদিন তিনি সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, 'চন্দনাদেবীকে কি আপনার পছন্দ হয়নি?'

প্রশ্নটা শুনে হাসবার যথেষ্ট কারণ থাকলেও বিষ্ণু গম্ভীর হয়ে বলল, ‘যদি সত্যি কথা বললে রাগ না করেন তাহলে বলব, হয়নি।’

—‘কিন্তু অভিজ্ঞতার তুলনায় চন্দনাদেবী যে অভিনয় ভালই করছেন তা তো অস্বীকার করতে পারেন না।’

—‘অস্বীকার করছি না।’

—‘তবে? আপনার মন খুলে অভিনয় না করার কারণ কি কাজরী?’

বিষ্ণু হেসে বলল, ‘আপনিই একদিন আমায় বলেছিলেন যে কাজরীর সম্বন্ধে আপনি আমার সঙ্গে কোন রকম আলোচনা করতে চাননা।’

কার্তিকবাবু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, ‘দেখুন বিষ্টুবাবু দেখতে দেখতে ‘উত্তরায়ণ’-এ আপনার অনেকদিন হয়ে গেল কিন্তু এখনও আপনাকে চিনতে পারলুম না। এক একবার মনে হয় আপনি ভিজে বেড়ালের মত থাকেন, আর ডুবে ডুবে জল খান। আবার কখন মনে হয় আপনি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক ওপরে।’

—‘না—না, আমি অত্যন্ত সাধারণ সাদাসিধে মানুষ। আমার কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু আপনি চিনতে পারেননি একজনকে যার মধ্যে এক অসাধারণ মানবী লুকিয়ে ছিল।’

—‘কার কথা বলছেন? কাজরী?’

—‘হ্যাঁ।’

কার্তিকবাবু কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বললেন, ‘কাজরীকে কি আর ‘উত্তরায়ণ’-এ ফিরিয়ে আনা যাবে না?’

—‘সম্ভবতঃ নয়।’

—‘শুনলুম যে সে কলকাতা ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। সে কি আর কলকাতায় ফিরবে না?’

—‘ফিরবে নিশ্চয়। তবে দেরি হতে পারে।’

—‘নিশ্চয় ফিরবে এ কথা বললেন কেন?’

বিষ্ণু হেসে বললে, ‘কোন মানে করে বলিনি। একটা বিশেষ কাজে

সে বাইরে চলে গেছে—কাজটা মিটে গেলে কলকাতায় ফিরে আসবে এইটেই স্বাভাবিক—তাই বলছিলাম, ফিরবে।'

—'কী কাজে? ঐ হাতী-ঘোড়া কি দেশের কাজ করবার জন্যে কাজরী নেচেছিল—সেই কাজে?'

—'হ্যাঁ।' বিষ্ণু মুচকি হাসল।

—'সে কথা যাক। —আপনাকে কী যেন বলছিলাম? হ্যাঁ—এবার থেকে চন্দনাদেবীর সঙ্গে আপনাকে একটু মন খুলে অভিনয় করতে হবে। যে যাই বলুক নায়ক-নায়িকার মধ্যে মনের মিল না থাকলে অভিনয় জমে না। খানিকটা ভাব থাকা দরকার।'

—'কিন্তু ভাবের মাত্রা বেড়ে গেলে আপনি আবার চটে যাবেন না তো?'

—'আপনিও দেখছি আমাকে এতদিনে চিনতে পারেন নি। ব্যবসা করতে নামলে রাগ করার কি আর উপায় থাকে? তবে ব্যবসার খাতিরে মাঝে মাঝে রাগ দেখাতে হয়। তাই দেখে আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। যান—।' বলে কার্তিকবাবু টেবিলের ড্রয়ার বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিলেন।

বিষ্ণু চলে গেল। কার্তিকবাবুও উঠে পড়লেন। কিন্তু আজ বিষ্ণু তাঁকে ভয়ানক অন্যমনস্ক করে দিয়ে গেল। কাজরী যে সাধারণ মানবী নয় এ কে আবিষ্কার করেছিল—বিষ্ণু না তিনি?

কার্তিকবাবুর কথায় পরের দিনই রিহার্সালে বিষ্ণু এমন সাবলীল অভিনয় করল যে শান্তা ভেবে পেল না কারণ কী? সে চুপ করে থাকতে পারল না। সুযোগ বুঝে বিষ্ণুকে জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ এমন সুবুদ্ধি হল কেন, জানতে পারি?'

—'তোমার চাকরি যাবার ভয়ে।'

শান্তা জবাব দিতে জানে। বললে, 'তাহলে স্বীকার করলে বল, যে আগে চেষ্টা করেছিলে যাতে আমার চাকরি যায়!'

—'শুধু চেষ্টা নয়, ভগবানের কাছে দু-বেলা প্রার্থনা করেছি।'

—'কেন? আমার চাকরি গেলে কাজরীকে আবার ফিরিয়ে আনতে সুবিধে হবে বলে?'

—'কাজরী ফিরে আসবে না।'

—'আসবে না?' শান্তা ব্যঙ্গ না করে পারল না। —'সাধলেও আসবে না? এতই তার অভিমান?'

—'অভিমান নয় অরুচি।'

এ কথার পর শান্তার আর স্পৃহা রইল না কিছু বলবার। বিষ্ণুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে সে চলে গেল।

বিষ্ণুর সঙ্গে এ ভাবে ঝগড়া করে শান্তার কোন কাজই এগোচ্ছিল না। কিন্তু ঝগড়া না করেই বা সে কী করবে? কাজরী 'উত্তরায়ণ' ছেড়ে গেছে বলেই যদি বিষ্ণুর রাগ হয় শান্তা কী করে সহ্য করবে বিষ্ণুর এই নির্লজ্জ বিরহ? এমন ভাবে কিছুদিন চললে বিষ্ণুকে শোধরানর আশা ছেড়ে দিতে হবে। তারপর শান্তা কী করবে সে নিজেই জানে না।

কমলাদির কথা শুনতে শান্তার আজকাল ভাল লাগে না। তিনি বিষ্ণুকে একদিনই দেখেছিলেন—কী চোখে দেখেছিলেন তিনিই জানেন!

দিদিমাকে মনের কথা খুলে বললে শান্তা হয়ত বেঁচে যেত। কিন্তু তার উপায় নেই। এমন নয় যে দিদিমা জানতে পারেননি শান্তার 'উত্তরায়ণ'-এ ঢোকার কথা। তিনি জেনেছেন আর নিদারুণ আঘাতও পেয়েছেন। কিন্তু মনকে বুঝিয়েছেন যে বাবার মৃত্যুর পর প্রথম সন্তান শান্তা সংসারের স্বচ্ছলতা বাড়াবার জন্যে যোগ্য কাজই করেছে। জানি অথচ জানিনা এই ভাবে তিনি ব্যাপারটা তাই

মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। একথা অবশ্য শান্তা ঘুণাক্ষরে টের পায়নি যে দিদিমা লুকিয়ে লুকিয়ে 'উত্তরায়ণ'-এ গিয়ে শান্তার অভিনয়ও দেখে আসতেন মাঝে মাঝে।

তেইশ

যাই হোক, এই পরিস্থিতির মাঝখানে কার্তিকবাবু একদিন বিষ্ণু, শান্তা ও আর কয়েকজন শিল্পীকে নেমন্তন্ন করলেন 'উত্তরায়ণ'-এর পরিচিত লেখক অদ্বৈতবাবুর নতুন নাটক শোনবার জন্যে।

বিষ্ণুর পৌঁছতে দেরি হওয়ায় অদ্বৈতবাবু নাটকখানি পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন। বিষ্ণু যখন গিয়ে হাজির হল তখন বেশ খানিকটা পড়া হয়ে গেছে। অদ্বৈতবাবু নিজের চেয়ার ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। বিষ্ণু লজ্জিত হয়ে 'থাক-থাক' বলে তাড়াতাড়ি আর একটা চেয়ার এগিয়ে এনে অদ্বৈতবাবুর সামনাসামনি বসে পড়ল। অদ্বৈতবাবু বললেন, নাটকটা তাঁকে গোড়া থেকে পড়বার অনুমতি দেওয়া হোক।

দুলাল বলে উঠল, 'চন্দনাদেবী অনেকক্ষণ বসে আছেন—তাঁর নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে, মুখে কিছু বলতে পারছেন না।'

শান্তা দুলালের কথায় একটু নড়ে-চড়ে বসে বলল, 'না—না, গল্পটা শুনতে ভালই লাগছিল।'

বিষ্ণু শান্তার ভুল সংশোধন করার উদ্দেশ্যে বলল, 'গল্প নয়, নাটক।'

অদ্বৈতবাবু শান্তার পক্ষ নিয়ে বললেন, 'চন্দনাদেবী ঠিকই বলেছেন

—যা দেখতে ভাল লাগে তা হল নাটক, যা শুনতে ভাল লাগে তা হল গল্প।'

কার্তিকবাবু অদ্বৈতবাবুর কথায় হা-হা করে হেসে উঠলেন। তারপর তাগাদা দিয়ে বললেন, 'নাও-নাও, শুরু কর। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

অদ্বৈতবাবু নতুন উৎসাহে গোড়া থেকে নাটকটা পড়তে শুরু করলেন এবং সকলে মন দিয়ে শুনছে কিনা তা মাঝে মাঝে যাচাই করে নিতে লাগলেন। শেষ পাতা পড়া হয়ে যেতে অদ্বৈতবাবু খাতাখানা বন্ধ করে মুখ তুলে চাইলেন। সকলকার মুখের দিকে তাকালেন পর পর। নাটকের কাহিনী যে সকলকে ভাবের রাজ্যে নিয়ে যেতে পেরেছে তা বুঝতে অদ্বৈতবাবুর দেরি হল না। মনে মনে তিনি গর্বিত ও তৃপ্ত হলেন। আশা করে চাইলেন কার্তিকবাবুর দিকে। কার্তিকবাবু কোন মন্তব্য না করে চাইলেন বিষ্ণুর দিকে। বিষ্ণু কপট গাম্ভীর্য দেখিয়ে বলল, 'নাটক উৎকৃষ্ট হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অদ্বৈতবাবু কতকগুলো সমস্যার সৃষ্টি করেছেন।'

অদ্বৈতবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'মানে?'

—'প্রথম কথা হল, নাটক এত ভাল হয়েছে যে তার সঙ্গে আপনার নামটা মোটেই মানাচ্ছে না।'

—'নাম?' অদ্বৈতবাবু থতমত খেয়ে গেলেন। —'নাটকের নাম বোধ হয় আমি বলিনি। যাই হোক 'দিন আগত ঐ' এ নামটা আপনার অপছন্দ হল কেন আমি তো বুঝতে পারছি না।'

শান্তা মাঝখান থেকে বলে উঠল—'চমৎকার নাম দিয়েছেন।'

দুলালও সায় দিল—'ওয়াণ্ডারফুল! আজ অবধি এ রকম নামের কোন নাটক পাবলিক ষ্টেজে অভিনীত হয়েছে বলে শোনা যায়নি।'

বিষ্ণু ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর দিল—'আমি নাটকের নামের কথা বলিনি। আমি বলছিলাম অদ্বৈতবাবুর নিজের নামের কথা।'

কার্তিকবাবু এবার যেন সংশয়মুক্ত হয়ে মুখ খুলতে পারলেন।

টেবিলের ওপর সজোরে একটা চাপড় মেরে বললেন, 'খাঁটি কথা। বিষ্টুবাবু ঠিক ধরেছেন—তোমার ও নাম চলবে না।'

—'চলবে না মানে ?'

—'চলবে না মানে চলবে না। তুমি যদি নাম না বদলাও আমি নাটকের নামের তলায় ছোট অক্ষরে ছাপিয়ে দেব, 'রচনা—অজ্ঞাত।'

—'তাহলে এ রচনা নিয়েও তোমার দরকার নেই।' বলে অদ্বৈতবাবু নাটকখানা বগলদাবা করে উঠে দাঁড়ালেন।

বিষ্ণু অপ্রস্তুত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, কার্তিকবাবু সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়ার খুলে একতাড়া নোট বার করে বললেন, 'তোমার ফী এক শ টাকা।'

অদ্বৈতবাবু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, 'বই বিক্রি করতে এসেছি—তাবলে নাম বিক্রি করতে আসিনি।'

কার্তিকবাবু আবার ড্রয়ার খুলে পাঁচখানা দশটাকার নোট বার করে বললেন, 'নামের জন্যে আরও পঞ্চাশ টাকা।'

অদ্বৈতবাবু এবার হেসে ফেলে বললেন, 'টাকার লোভ দেখিও না কাত্তিক। ভাল হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি!'

অদ্বৈতবাবুর মুখে হাসি দেখে বিষ্ণুর ধড়ে যেন প্রাণ এল। কী কুক্ষণেই সে নামের রসিকতাটা করতে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি অদ্বৈতবাবুর বাঁ হাতটা ধরে বললে, 'বসুন—বসুন। রাগ করবেন না—জানেন তো, আমরা সকলেই এক নৌকোর যাত্রী। 'উত্তরায়ণ'-এ ঢুকে আমাদেরও পিতৃদত্ত নাম কাটা গেছে।'

অদ্বৈতবাবু নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'তা আমি শুনব না। আপনার পিতৃদত্ত নাকটা কেটে যদি বলেন নাক কাটার মধ্যে কোন লজ্জা নেই, আমি আপনার কথা শুনে নিজের নাকের মায়া ছাড়তে পারব না।'

কার্তিকবাবু বললেন, 'দেখছ তো, জগৎটাই মায়া! তবে আর নামের ওপর অত মায়া কেন ?'

—'মায়া এই জন্যে যে মরে গেলে কায়াটা শূন্যে মিলিয়ে যাবে, নামটাই থাকবে।'

শান্তারও এবার লোভ হল বাক্‌যুদ্ধে নামবার। সে বলে উঠল, 'কিন্তু এই নামটা বাদ দিয়ে অন্য কোন ভাল নামও তো রেখে যেতে পারেন!'

—'উঁহু! আপনি ভুল করছেন চন্দনাদেবী। ফোটো আর নাম এক পর্যায়ে ফেলবেন না। মানে, আমি কাত্তিককে বলতে পারি, ওহে, আমি মলে আমার এই ফোটোটা কাগজে না ছাপিয়ে ঐ ফোটোটা ছাপিও। কিন্তু নামের বেলায় ও আবদার চলবে না। তাছাড়া বেঁচে থাকতে গেলেও নামটাই তো আমার একমাত্র অবলম্বন। যারা আমার 'অদ্বৈত' নামটা খাঁটি বলে মেনে নিয়েছে তারা যদি শোনে যে আমার দ্বিতীয় নাম আছে, তাহলে জীবিতদার প্রণয়ীর মত প্রবঞ্চনাদোষে তারা তো আমায় সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করবে!'

শান্তা তবু বলল, 'কিন্তু আগেকার দিনে একজনের বহু নাম থাকায় তো কোন অসুবিধে হত না?'

—'তখনকার দিনে এক পুরুষের বহু ভার্যা থাকাটাও দোষনীয় ছিল না।'

বিষ্ণু এবার শান্তার হয়ে বলল, 'সে কথা নয়। দেবদেবীর বেলাতেও দেখুন নামের ছড়াছড়ি। তাবলে তাঁদের এক নাম অন্য নামের মাহাত্ম্য কমিয়ে দিয়েছে বলে তো শোনা যায় নি?'

—'একজন দেবতা বা দেবীর নাম করুন।'

—'কেন? শ্রীকৃষ্ণকেই ধরুন না—যাঁর অষ্টোত্তর শত নাম।'

—'শ্রীকৃষ্ণ যা বললেন ঐটেই হল ওঁর আসল নাম। বাকী এক শ সাতটা নাম ওঁর টাইটল্—যেমন কে-টি, সি-আই-ই, কে-সি-এস-আই, কে-সি-ভি-ও ইত্যাদি।'

অদ্বৈতবাবুর জবাবে কার্তিকবাবু উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়লেন। বললেন 'তোমার নাম আর পঞ্চাশ টাকা দুটোই তুমি জিতলে।'

সকলে হাসতে লাগল।

হাসি থামতে বিষ্ণু বলে উঠল, 'অদ্বৈতবাবুর নাটকের দ্বিতীয় সমস্যা হল শিশু-চরিত্র।'

বিষ্ণুর কথায় কার্তিকবাবুর টনক নড়ল। বললেন, 'সে কথা তো আমার মাথায় আসেনি! অত শক্ত পার্ট করার জন্যে অত ছোট ছেলে কোথায় পাওয়া যাবে? নাঃ—অদ্বৈতর কপালে অর্থলাভ নেই তা আমি আর কী করব?'

—'তার মানে?' অদ্বৈতবাবু প্রতিবাদ করলেন—'নাটক লিখেছি বলে কি পাত্রপাত্রী যোগাড় করার দায়িত্বও আমার?'

—'তা নয় নাই হল। কিন্তু দেখছ তো এ লাইনের অবস্থা। জেনেশুনে কোন ভদ্রলোক তাঁর কইয়ে বইয়ে ফুটফুটে ছেলেটিকে ছেড়ে দেবেন বল থিয়েটার করতে?'

শান্তা একটি ছোটছেলের মা হয়ে অভিনয় করার সুযোগ অত সহজে ছেড়ে দিতে চাইল না। বললে, 'খুঁজলে কি আর পাওয়া যাবে না?'

বিষ্ণু সায় দিল। —'না পাওয়ার কোন কারণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের পাড়াতেই এমন দু-চারটি ছেলে আছে যাদের অভিনয় দেখলে তাক লেগে যায়।'

কার্তিকবাবু বিষ্ণুর কথা অবিশ্বাস করতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের পাড়ায়? মানে, আনন্দ নিয়োগী লেনে?'

—'হ্যাঁ। আর সবচেয়ে ভাল অভিনয় করে ভগবান স্যাকরার ছেলে খুশী।'

—'ভগবান স্যাকরা?'

—'বাড়ি ভাড়া করার সময় দুলাল যার কাছে আমায় নিয়ে গিয়েছিল।'

কার্তিকবাবু আবার যেন মত বদলালেন। বললেন, 'না-না, অত ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই। অদ্বৈত বরঞ্চ নাটকটা কেটেছেঁটে এমন করে দেবে যাতে কোন ছোট ছেলেকে ষ্টেজে না নামাতে হয়।'

শান্তা শুনে খুশি হল না। বললে, 'তাহলে নাটকের আসল সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে।'

অদ্বৈতবাবু বললেন, 'সে কথা এক শ বার।'

বিষ্ণু তখন কার্তিকবাবুকে অনেক করে বোঝাল যে ভগবান স্যাকরার সঙ্গে তার যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা আছে। সে তার ছেলেকে চাইলে ভগবান না বলবে না। তাছাড়া ছেলেটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা, পৌঁছে দেওয়া, অভিনয় শেখান, এ সমস্ত কিছুর ভার বিষ্ণু নিতে রাজী আছে।

কার্তিকবাবু অবশেষে মত দিলেন। তবে শর্ত করলেন যে ভগবান স্যাকরার ছেলের অভিনয় দেখে যদি তাঁর পছন্দ না হয় তাহলে ছোটছেলের পার্টই কাটা যাবে বই থেকে—কারণ নতুন ছেলে পরে কেমন উতরবে এ ভেবে তিনি নাটকের ওপর টাকা ঢালতে পারবেন না।

বিষ্ণু শর্ত মেনে নিল। আর দিন দুই পরেই ভগবানের ছেলে খুশীকে এনে হাজির করল কার্তিকবাবুর ঘরে। সেদিন রিহার্সাল ছিল। ষ্টেজে শান্তা, দুলাল আরও অনেকে বসেছিল। বিষ্ণু গিয়ে সকলকে ডেকে আনল খুশীর অভিনয় দেখবার জন্যে। ঠিক হল অদ্বৈতবাবুর নাটকের ভূমিকা দিয়েই খুশীর পরীক্ষা হবে। খুশী প্রস্তুত হল। কার্তিকবাবু দৃশ্য বেছে দিলেন। শান্তাও থাকবে তার মধ্যে।

শান্তা আর খুশী কোন রিহার্সাল না দিয়ে দৃশ্যটি এমন ফুটিয়ে তুলল যে সকলের মুখ থেকে বারে বারে বাহবাধ্বনি শোনা যেতে লাগল। কার্তিকবাবু আনন্দে গদ গদ হয়ে বিষ্ণুকে বললেন, 'শেষপর্যন্ত আপনারই জিত হল।' শান্তা পরম আদরে খুশীকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

খুশীকে পেয়ে শান্তার মনে হল তার অশান্ত মনকে শান্ত করার জন্যে ঈশ্বর যেন এক উপলক্ষ জুটিয়ে দিলেন। খুশী এবার মধ্যস্থ হয়ে দাঁড়াবে তার আর বিষ্ণুর মাঝখানে। শান্তার কপাল থেকে পাথর যেন এতদিনে তুলে নিলেন ভাগ্যবিধাতা।

খুশীর ভূমিকা বাদ না পড়ায় দুলালের উৎসাহও বেড়ে গেল। কারণ নাটক যে ভাবে লেখা হয়েছে তাতে শান্তা আর খুশীই দর্শকের মনোহরণ করবে, বিষ্ণু ভেসে যাবে। নাটকটি মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত

হতেই দুলাল তাই বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন বার করে দিল কাগজে।

নাটকের রিহার্সালও শুরু হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরে বিষ্ণু কাজরীর কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। কাজরী লিখেছে—'তোমাদের 'দিন আগত ঐ' নামে নতুন এক নাটকের বিজ্ঞাপন কাগজে দেখছি। নাটকের নামটা নতুন ধরনের তো বটেই, তা ছাড়া নতুন ধরনের চরিত্রও তাতে আছে তা বুঝতে পারলাম একটি ছোট ছেলের নাম দেখে। নাবালক ছেলেটিকে না নামালেই ভাল ছিল। আমাকে তুমি সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেছ বলেই আমার মনের কথা জানালুম। এবং সেই অধিকারে অনুরোধও করছি, দোহাই তোমার, ছেলেটিকে তার বাপ-মার কাছে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।'

বিষ্ণু চিঠিখানা অনেকবার পড়ল। তার সন্দেহ হল, কাজরী কি সত্যি তার মন থেকে এসব কথা লিখেছে, না ভগবান স্যাকরা বিষ্ণুর মুখের ওপর কিছু না বলতে পেরে কাজরীকে দিয়ে লিখিয়েছে, যাতে তার ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবার আগে তাকে সে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে ?

শান্তার সঙ্গে দেখা হতেই বিষ্ণু পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে বললে 'পড়।'

—'কার চিঠি ?'

—'কাজরীর।'

শান্তার ভুরু কুঁচকে উঠল। খামখানার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার স্পৃহা নেই।'

—'কেন ?'

শান্তার স্বর উত্তেজিত হয়ে উঠল।—'জিজ্ঞেস করছ 'কেন ?' এত নির্লজ্জ হয়ে গেছ তুমি যে আমায় বলছ তোমার বস্তির প্রেমিকার চিঠি পড়তে ? ও চিঠি ছুঁতেও আমার ঘেন্না হয়।'

বিষ্ণু হেসে বলল, 'তোমার যদি সত্যিই সে বোধ থাকত তাহলে কাজরীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্যে তুমি এমন জায়গা বেছে নিতে না যেখানে সে ছিল তার দেহের ঐশ্বর্যে গরীয়সী।'

—'তার মনের ঐশ্বর্য যেখানে গচ্ছিত আছে সেখানে ঢোকবার অধিকার তো আমার নেই।'

—'অধিকার যদি কারুর থাকে তো তোমারই আছে—একথা তুমি ভাল করেই জান। তবে সে ঐশ্বর্য দেখবার ধৈর্য তোমার নেই। যদি থাক্‌ত তাহলে নিজের ঐশ্বর্যের সন্ধানও তুমি পেতে।'

—'যতটুকু দেখেছি তাই যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশী দেখবার বাসনা আমার নেই।'

বিষ্ণু আর তর্ক করল না। বুঝল যে শান্তার মনে যে বিষবৃক্ষ বদ্ধমূল হয়ে তার মনের সব রস শুষে টেনে নিচ্ছে তাকে উচ্ছেদ করা একদিনের কাজ নয়।

কাজরীকে সে লিখল যে ছোট ছেলেটির সম্বন্ধে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। বিষ্ণুই নিজের দায়িত্বে তাকে নিয়ে এসেছে আর কাজরী হয়ত বুঝতে পেরেছে যে ক্ষুদে অভিনেতাটি কে! ও আর কেউ নয়, ভগবান স্যাকরার ছেলে খুশী—বিষ্ণুর প্রতিবেশী এবং বন্ধু।'

চব্বিশ

'দিন আগত ঐ' নাটকের রিহার্সাল পুরোদমে চলছিল। উদ্বোধনের দিনও কার্তিকবাবু একরকম স্থির করে ফেলেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন সকালে বিষ্ণু খবর পেল যে কার্তিকবাবু মৃত্যুশয্যায়। কার্তিকবাবুর বাড়ি পৌঁছে শুনল আধঘণ্টা আগে তিনি ইহধাম থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন।

কী হয়েছিল তা সঠিক জানা গেলনা। দিন কয়েক আগে রাতের বেলা বাথরুম যেতে গিয়ে পড়ে যান। মাথার খুলিতে চোট লেগে আবের মত ফুলে উঠেছিল। তবে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছিল ফুলোটা। কাল রাত্তিরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন। বললেন মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। সারারাত ঘুমোননি। বড় বড় ডাক্তার ছোটাছুটি করলেন রাতভোর—টেলিফোনের ওপর টেলিফোন—নার্স—ইনজেকশান। কথা ছিল সকালে মাথার খুলি অপারেশান করা হবে হাঁসপাতালে। কার্তিকবাবুকে নিয়ে যাওয়া গেল না। ভোর থেকে অক্সিজেনের নল মুখে লাগিয়ে শেষ নিঃশ্বাস নিলেন বেলা দশটায়।

কার্তিকবাবুর নানা স্মৃতি বিষ্ণুর মনে পড়তে লাগল। 'উত্তরায়ণ-এ তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, কাজরীর সম্বন্ধে আলোচনা, অদ্বৈতবাবুর সঙ্গে নাম নিয়ে রসিকতা। খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলো বিষ্ণুর চোখের সামনে দিয়ে যেন ভেসে যেতে লাগল।

কার্তিকবাবু যেমনই হোন, বিষ্ণু তাঁর কাছ থেকে একাধারে যে সম্মান, সাহায্য ও স্নেহ পেয়েছিল তা অন্যলোকে অন্নদাতার কাছে সহজে পায় না। দুলালের বন্ধু জেনেও বিষ্ণুকে তিনি বরাবর 'আপনি' বলে গেছেন যাতে 'উত্তরায়ণ'-এর অন্যান্য শিল্পী ও কর্মচারীদের কাছে বিষ্ণুর

মান বজায় থাকে। অথচ, দুলালের বন্ধু হিসেবে বিষ্ণুর ন্যায্য দাবি মেটাতেও দ্বিধা করেননি কোনদিন। এমন এক ব্যক্তির আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হওয়া যে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বিষ্ণুর মনে সে ভয় স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।

কার্তিকবাবুর নশ্বর দেহকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে দলে দলে লোক আসতে লাগল। তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, উত্তরায়ণ'-এর কর্মচারীরা। বিষ্ণু দাঁড়িয়েছিল শবানুগমন করবে বলে। দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে চলল। শবদেহ নামাতে বিকেল হয়ে গেল।

বিষ্ণু হেঁটেই যাবে ঠিক করেছিল। হঠাৎ দেখল শান্তা আসছে বাড়ির ভেতর থেকে। সেও শোকার্ত। দুলাল তার পেছু পেছু আসছে। শান্তাও শবযাত্রায় যোগ দিল মোটরে। বিষ্ণুকে দেখতে পেলনা ভিজে চোখের ভেতর দিয়ে।

বিষ্ণুর মনটা বিষিয়ে গেল। শান্তা কেন এ বাড়িতে ? তবে কি দুলাল তাকে এনে দাঁড় করিয়েছিল কার্তিকবাবুর মৃত্যুশয্যার পাশে ? দুর্বল মুহূর্তে কার্তিকবাবুর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিয়েছে তার মুখ থেকে ? কিছুই বিচিত্র নয়।

চলতে চলতে বিষ্ণু ক্রমশঃ পেছিয়ে পড়ছিল। অসংলগ্ন অনেক চিন্তা তাকে উত্যক্ত করে তুলেছিল। দুলাল আর শান্তার কথাই ভাবছিল সে। দুঃসময়ে দুলাল না হোক তার মামার দৌলতে আশ্রয় পেয়েছিল সে 'উত্তরায়ণ'-এ। সামান্য আশ্রয় হলেও তারই মধ্যে আদর্শকে নতুন করে গড়তে শিখল কার্তিকবাবু আর কাজরীর সংস্পর্শে এসে। তার জন্যে দুলালের কাছেই তাকে কৃতজ্ঞ হতে হবে বৈকি! তাবলে দুলাল যদি প্রতিদানে শান্তাকে দাবি করে তাহলে মূল্য দিয়েই তো উপকার ক্রয় করা হল—কৃতজ্ঞতার মূল্য রইল কোথায় ? এ লেনদেনে রাজী হওয়ার মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না। যদি দরকার হয় সে 'উত্তরায়ণ' ছেড়ে চলে যাবে—আর শান্তাকে জিজ্ঞেস করবে, তার লক্ষ্য এবার কোন দিকে ? সে প্রশ্নই হবে শান্তার অগ্নিপরীক্ষা।

কার্তিকবাবুর মৃত্যুর পর দুলালই 'উত্তরায়ণ'-এর গদিতে বসবে এর মধ্যে কোন যদি ছিল না। বন্ধুর কাছে কর্মচারী হয়ে হাজরি দিতে বিষ্ণুর তাই বাধ বাধ লাগছিল। ভাবছিল দুলাল হয়ত নতুন সম্পর্কটা মানিয়ে নেবার একটা উদার পন্থা দেখাবে। কিন্তু হপ্তাখানেক কেটে যাবার পরও দুলালের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

দুলালের তখন বিষ্ণুর জন্যে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল একটা মর্মান্তিক খবর পেয়ে। কার্তিকবাবু নাকি তাঁর বিপুল সম্পত্তি থেকে দুলালকে এক রকম বঞ্চিত করে গেছেন। আর তা দিয়ে গেছেন তাঁর এক অবৈধ সন্তানকে। এত বড় অবিচার কেউ করতে পারে এ যেন কল্পনাও করা যায় না। যে অবিবাহিত উদারচেতা ভদ্রলোক তাঁর একমাত্র ভাগ্নেকে পোষ্যপুত্রের মত ছোট থেকে মানুষ করে এলেন, দুলাল ছাড়া আর যাঁর দ্বিতীয় ওয়ারিস ছিল না, তিনি কিনা ঢাক পিটিয়ে নিজের কেলেঙ্কারি এইভাবে জাহির করে গেলেন! মামার সুনাম বাঁচানর জন্যেও দুলালের উচিত সম্পত্তি হস্তান্তর হতে না দেওয়া। দুলাল দুবেলা ছোটাছুটি করতে লাগল উকিল শ্যামাচরণবাবুর বাড়িতে।

কার্তিকবাবুর বাল্যবন্ধু শ্যামাচরণবাবু দুলালকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বারণ করলেন উতলা হতে। বললেন, 'কাত্তিক তোমায় শুধু মানুষ করেছে বললে অন্যায় বলা হয়, রাজপুত্তুরের মত ভোগে রেখেছিল এতদিন। তাছাড়া কিছু না কিছু না করেও তোমায় যা দিয়ে গেছে তুমি ফুঁকে না দিলে সারাজীবন তাই ভাঙ্গিয়েই খেতে পারবে। তবে এত দুঃখু পাচ্ছ কেন?'

দুলাল মনের রাগ চেপে বললে 'আমার দুঃখু সে জন্যে নয়। আমার মনে হচ্ছে তাঁর ছেলেটেলে কিছু নেই—ব্যাপারটা আগাগোড়া সাজান হয়েছে শুধু আমায় ঠকানর জন্যে। যদি উইলও থাকে তবে তা জাল।'

—'জাল ? কী বলছ তুমি ? জাল করল কে ? তোমায় ঠকাবার জন্যে এ অপকর্ম করবেই বা কে ? হ্যাঁ—এক আমায় যদি সন্দেহ কর তো আলাদা কথা। তবে তোমায় আমি এটুকু ভরসা দিতে পারি যে উইল জাল নয়।'

—'কিন্তু ছেলে যে জাল নয় তার প্রমাণ কী ?'

—'সে সব প্রমাণ তুমি পাবে অখন। আপাততঃ এ নিয়ে মাথা গরম কোর না। কাত্তিকের শেষ কাজটা যাতে সুসম্পন্ন হয়, তার আত্মার যাতে শান্তি হয়, তাই আগে দেখ। কাজকর্ম চুকে গেলে আবার এস, তখন যা যা জানতে চাও বুঝিয়ে দেব।'

দুলাল অত সহজে শ্যামাচরণবাবুর কথা মেনে নিল না। তার এক উকিল-বন্ধু রজনীকে দেখতে বলল ছলেবলেকৌশলে হাতছাড়া সম্পত্তি হস্তগত করা যায় কিনা। মোটা ভাগের লোভও দেখাল তাকে। রজনী বললে, 'আগে উইলের কপিটা বার করে দেখি কী ব্যাপার।'

দুলাল আগাম দিয়ে দিল অনেকগুলো টাকা। কয়েকদিনের মধ্যেই উইলের কপি বার করে আনল রজনী। দুলাল পড়তে পড়তে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার হাতদুটো ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। মামার অবৈধ সন্তান ও তাঁর বার আনা বিষয়ের উত্তরাধিকারী খুশী ? ভগবান স্যাকরা তার কেউ নয়—কাজরী তার মা ?

দুলাল শরবিদ্ধ শার্দুলের মত হিংস্র মন নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। তার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল কাজরীর ওপর। মনে হল শত্রুতা তারই। কাজরী নিশ্চয় জানত মামার উইলের কথা, আর কোথায় তাঁর দুর্বলতা। তাই সে দুলালের তোয়াক্কা করেনি। সাদা কাগজে কালির আঁচড় কাটবার লোভে বিষ্ণুকেই দিয়েছে কলঙ্কের খোঁচা। তাবলে দুলাল চড়ের বদলে অন্য গাল পেতে দেবে না। শয়তানিতেই দেবে শয়তানির জবাব।

দেরি হলে তার উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যেতে পারে এই ভেবে দুলাল তার পরদিনই 'উত্তরায়ণ'-এর সব শিল্পী ও কর্মচারীদের জরুরী তলব করল।

সন্ধ্যাবেলা বিষ্ণু এসে দেখল দুলাল দখল করে বসেছে কার্তিকবাবুর

গদি-আঁটা চেয়ারটা। ঘরে তিলধারণের জায়গা নেই। শাস্তা বিমর্ষ হয়ে বসে আছে দুলালের পাশে।

বিষ্ণুকে দেখে শাস্তা সোজা হয়ে বসল। তার মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল বিষ্ণুর ঠোঁট বেঁকান লক্ষ করে।

দুলাল শোকাভিভূত। অশৌচ নিয়েছে সে জোর করে। কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে বলতে লাগল, 'আমার মামার চেয়ারে আমি আজ বসেছি বলে আমায় তাঁর সঙ্গে তুলনা করবেন না। তিনি ছিলেন দেবতা আর আমি নিজেকে মানুষ বলারও যোগ্য নই। আমার দোষত্রুটি আপনারা ভালবেসে মানিয়ে না নিলে আমি নিরুপায়। —আমি আজ আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি একটা বিশেষ দরকারে। আমি ভেবেছিলাম মামার শ্রাদ্ধশান্তি না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের কষ্ট দেব না—'উত্তরায়ণ' বন্ধই রাখব মামার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে। কিন্তু কদিন ধরে রোজ রাত্তিরে আমি মামার স্বপ্নাদেশ পাচ্ছি। তিনি বলছেন 'দিন আগত ঐ' বইটার উদ্বোধন তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে—ওঁর খুব ইচ্ছে বইটা দেখেন।'

দুলালের কথা শুনে সকলের মনে সশ্রদ্ধ ভীতির সঞ্চার হল। সবাই কথা দিলেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে নাটকটির উদ্বোধন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত করতে কারুর চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না। দুলাল আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল সবাইকে। আর—সে ভুলে গিয়েছিল বলতে যে কার্তিকবাবু এই উপলক্ষে সকলকে এক মাসের বোনাস দেবার আদেশও স্বপ্নে জানিয়েছেন—উপরন্তু খুশীর বাবার হাতে মোটারকমের কিছু টাকা ধরে দেবার কথা বলেছেন।

বিষ্ণু সরল বিশ্বাসে জিজ্ঞেস করল, 'কত টাকা দেবে ঠিক করেছ?'

—'ঠিক কিছু করিনি—তুমি যা বলবে তাই দেওয়া যেতে পারে।'

পঁচিশ

ভগবানের চিঠিতে কার্তিকবাবুর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কাজরীর মুখ সাদা হয়ে গেল। ভগবান অনেক কথা লিখেছে সেই সঙ্গে। কার্তিকবাবুর উকিল-বন্ধু শ্যামাচরণবাবু ভগবানকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছেন খুশীকে নাকি অনেক টাকা দিয়ে গেছেন বড়কর্তা। তাই খুশীকে সাবধানে রাখা দরকার। তার মা যত তাড়াতাড়ি পারে খুশীকে যেন তার কাছে নিয়ে যায়।

কাজরী বুঝতে পারল না এর মানে। তবে কি খুশী নির্ভয়ে নেই? কার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হবে তাকে? কাজরী অস্থির হয়ে উঠল কলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে। সেদিন আর ট্রেন ছিল না। তবু সঙ্গে সঙ্গে সে গোছগাছ শুরু করে দিল।

কাজরীর ব্যস্ততা ও মুখের চেহারা দেখে ক্যাম্পের সকলে বুঝেছিল যে কোন দুঃসংবাদ পেয়ে ঊষাদি কলকাতায় যাচ্ছেন। কিন্তু কী হয়েছে? কোন খারাপ খবর আসেনি তো?

প্রশ্নগুলো কাজরী এড়িয়ে গেল। তার বলার উপায় ছিল না যে তার সন্তান খুশী আজ শুধু পিতৃহীন নয়, সে আজ বিপন্ন। কাজরী শুধু বলল, 'মণিদি, অনিল এরা সব রইল। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।'

যে গ্রামে 'ঊষা-সংঘ' কাজ করছিল সেখান থেকে হাঁটা-পথে প্রায় এক ক্রোশ গেলে রেলের স্টেশন। ঊষাদিকে ট্রেনে তুলে দিতে সেই পথ ধরে দলের সকলে নীরব মিছিলের মত চলতে লাগল।

বর্ষার দেরি নেই। চক্রবালে কালো মেঘের ছায়া মরীচিকার মত লোভ দেখাচ্ছে। নিরম্বু-উপবাসিনীর মত শুকনো পৃথিবী পলে পলে

দগ্ধ হচ্ছে—ক্ষেতগুলোর বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। সব গাছ কাঁটাগাছ বলে ভুল হচ্ছে।

এ দৃশ্যপটের সঙ্গে কাজরীর মনের কোথায় যেন মিল আছে!

সকলে মিলে স্টেশনে পৌঁছবার অনেক পরে ট্রেন এল। ছোট স্টেশন। ঘোড়ায় জিন দিয়ে ট্রেন দাঁড়ায়। কাজরী কামরায় উঠতে না উঠতে ট্রেন ছেড়ে দিল। সকলের সঙ্গে ভাল করে চোখোচোখিও তার হল না ট্রেন থেকে।

কলকাতা প্রায় ঘণ্টাতিনেকের পথ। পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর পেরিয়ে গেল।

হাওড়া স্টেশনে নেমে কাজরীর হঠাৎ ভয় করতে লাগল। এই সে মহানগরী—যেখানে সে পথ হারিয়েছিল। কিন্তু সত্যিই কি সে পথ হারিয়েছিল? না, পথ বেছে নিয়েছিল? সারাজীবন ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে যে ভোগের এক অংশও সে পেত কিনা সন্দেহ তাই তাড়াতাড়ি দু-হাত ভরে পাবার জন্যে সে কি পা বাড়িয়েছিল অন্য পথে? ছ-দিন ছেড়ে ছ-বছরের পথ সে কি অতিক্রম করতে গিয়েছিল ছ-দণ্ডে?

আজ কার্তিকবাবু ইহজগতে নেই। কিন্তু যদি অন্য কোন কার্তিকবাবু এসে বলেন যে জীবনের সার্থকতা পর্যটনে নয়, আগে পৌঁছনর পরিতৃপ্তিতে—যদি বলেন প্রাপ্তিটাই সব, পন্থাটা কিছু নয়—তবে কি সে আবার সেই পথ বেছে নেবে, যে পথে দেবার লোক অনেক, কিন্তু নেবার লোক নেই?

কী মনে করে কাজরী চলে গেল একটা কাপড়ের দোকানে। সেখান থেকে বড়গঙ্গার ঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে, সদ্যকেনা একখানা কোরা থানকাপড় সে পরল। নরম কাপড়ের আঁচলটা মুঠো করে ধরে তার যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে এল, মনে হল এই কাপড়ই তার বিপদভঞ্জন মধুসূদন!

ছাব্বিশ

কড়ানাড়ার শব্দ পেয়ে ভগবান দরজা খুলে চমকে উঠেছিল কাজরীর বিধবাবেশ দেখে। ট্যাক্সি থেকে কাজরীর বিছানা আর সুটকেস নামিয়ে ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিল। মালপত্তর ঘরে তুলে ভেতর থেকে একটা ভাঙ্গা চেয়ার বয়ে আনল কাজরীর জন্যে। বৌকেও খবর দিয়ে এল, কাজরীদিদি এসেছেন।

'খুশী কোথায় ?' কাজরী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

ভগবান ইতস্তত: করে বললে, 'একটু আগেই বিষ্টুবাবুর সঙ্গে থিয়েটারে গেল।'

কাজরী চিন্তিত হয়ে বললে, 'রোজ যায় ?'

—'হ্যাঁ। মাঝে কদিন বন্ধ ছিল। আবার তো যাচ্ছে—কালই নাকি আসল থিয়েটার।'

—'কাল ?' কাজরী বুঝতে পারল না এই দুঃসময়ে কাল কিসের আসল থিয়েটার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'কখন ফেরে ?'

—'তা বেশী রাত করে না। আটটার মধ্যেই ফেরে—দু-একদিন একটু দেরি হয়ে যায়।'

ভগবানের বৌ ঘরে ঢুকল। কাজরীর জন্যে চা-জলখাবার নিয়ে এসে একটা নড়বড়ে টেবিলের উপর সাবধানে রাখল। কাজরী বলল, 'ওসব নিয়ে যাও ভাই—আমি এখন আর কিছু খাব না।'

ভগবানের বৌ সাধতে সাহস করল না কাজরীর থানকাপড় দেখে।

ভগবান জিজ্ঞেস করল, 'আজ রাত্তিরে আবার বাড়ি যাবেন না এইখানেই থাকবেন ?'

—'তাই ভাবছি। একটা রাত এইখানে কাটিয়ে দিলে মন্দ হত না।'

খুশীর জন্যে কাজরী ছটফট করতে লাগল। ভগবানের বাড়িতে একটিমাত্র ঘড়ি—কালো কার বাঁধা গোল পকেট-ওয়াচ—রাস্তায় যাবার সময় যেটুকু ভগবানের পকেটে থাকে—তাছাড়া সর্বক্ষণ দেয়ালেই ঝোলে—কি দোকানে, কি বাড়িতে। ঘড়িটাও আবার তেমনি। তার কাঁটা যেন নড়তেই চায়না।

প্রায় সওয়া আটটা বাজতে চলল তখনও খুশীর দেখা নেই। কাজরী অস্থির হয়ে বারে বারে রাস্তার দিকের জানলাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। হঠাৎ দূর থেকে দেখতে পেল খুশী বিষ্ণুর হাত ধরে নাচতে নাচতে আসছে। আশ্বস্ত হয়ে কাজরী জানলা থেকে সরে গেল।

ভগবান দরজা খুলতে বিষ্ণু বাইরে থেকে বলল, 'এই নাও তোমার ছেলে। বেচারীর আজ খুব খাটুনি গেছে। তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাইয়ে ঘুমপাড়িয়ে দাও। কাল ওর থিয়েটার। দুপুরে ঘণ্টাখানেক যেন ঘুমোয়। আমি কাল ঠিক চারটের সময় এসে নিয়ে যাব।'

খুশী ঘরের ভেতর ঢুকেই 'মা-মা' বলে কার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিষ্ণু বুঝতে পারল না। সে অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে বাড়ি চলে গেল—অন্যদিন তো মাকে দেখে খুশীর এত আনন্দ হয় না! বোধ হয় কাল থিয়েটার তাই ওর আজ এত ফূর্তি!

রাত্তিরে শুতে গিয়ে খুশীর ঘুম মাথায় উঠে গেল। তার আর মার বিছানা আজ পাশাপাশি পাতা হয়েছে বাইরের ঘরে। তার বাবু আর বড়মা শোবে ভেতরের ঘরে। সে আজ আর মাকে ছাড়বে না। সারারাত গল্প শুনবে জেগে জেগে।

কাজরী খুশীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'আজ লক্ষ্মীছেলে হয়ে ঘুমোও, কাল তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যাব—

সেখানে তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকব, একসঙ্গে ঘুমোব—কেমন ?'

খুশী তড়াক করে উঠে পড়ে বিছানার ওপর বাবু হয়ে বসল। মার গলা জড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সঙ্গে কোথায় যাব মা ? অনেক দূরে ? অন্য দেশে ?'

—'হ্যাঁ, দেখোনা, কী সুন্দর দেশে তোমায় নিয়ে যাব। কিন্তু কাউকে একথা বোলোনা, তোমার বিষ্টুদাকেও না। তাহলে বিষ্টুদা বলবে, খুশী এখানে যেমন আছে থাক—তার মা চলে যাক অন্য দেশে।'

খুশী সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে বসল, 'অন্য দেশে থিয়েটার আছে ?'

—'না বাবা। বেশী থিয়েটার করতে নেই—দেখতেও নেই। তোমার কি এখন থিয়েটার করে দিন কাটালে চলবে ? তোমায় কত লেখাপড়া করতে হবে। বিদ্বান হতে হবে।'

—'কেন ? বিষ্টুদাও তো কত কত থিয়েটার করে।'

—'বিষ্টুদা আগে কত লেখাপড়া করেছে জাননা বুঝি ? এত মোটা মোটা বই সব পড়েছে—কত পাশ করেছে—কত প্রাইজ পেয়েছে—তাই তো এত ভাল থিয়েটার করতে পারছে।'

খুশী হাঁ হয়ে তার মার মুখের মিষ্টি কথা শুনছিল। বললে, 'কিন্তু কাল তুমি আমার থিয়েটার দেখতে যাবে তো ? কখন যাবে ? আমাদের সঙ্গে ?'

—'না—পরে যাব।'

—'পরে কেন ?' খুশী অধৈর্য হয়ে উঠল—'পরে যদি টিকিট না পাও ? কী করে ঢুকবে ? আমাদের সঙ্গে গেলে তোমার টিকিট লাগবে না। আমি বিষ্টুদাকে বললেই বিষ্টুদা তোমায় নিয়ে যাবে।'

—'খবরদার।' কাজরী ঘাবড়ে গেল। —'আমি এসেছি শুনলে বিষ্টুদা আর তোমায় যেতে দেবেনা আমার সঙ্গে। বিষ্টুদাকে কোনদিন বলনি তো যে বড়মা ছাড়াও তোমার আর একটা মা আছে যে

লুকিয়ে লুকিয়ে এসে তোমায় আদর করে যায়, চুমু খেয়ে যায়, আর ফিরে গিয়ে কাঁদে ?'

খুশীর চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, 'না। কাউকে বলিনি।'

খুশী শুয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারছিল না তার মা তাকে কাল কোথায় নিয়ে যাবে। মার থানকাপড়টার দিকে তাকিয়ে একটা অজানা ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। সে কি তবে বিধবা মায়ের ছেলে ? বাবু-বড়মা তার সত্যিকারের বাবা-মা নয় ? ঘুমে খুশীর চোখ ঢুলে আসছিল। সে ভাবতে পারছিল না। ভাববারই বা কী আছে ? মা তো পাশেই বসে আছে! সারারাত থাকবে তার কাছে। কাল থেকে মাকে ছেড়েও আর থাকতে হবে না।

তন্দ্রার ঘোরে খুশী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। কিছুক্ষণ পরেই সে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেল।

খুশী ওঠবার অনেক আগেই কাজরী উঠে পড়েছিল। খুশীর থিয়েটার করাতে তার ঘোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও মনে মনে গর্বিত না হয়ে পারছিল না সে। সূর্যদেবকে প্রণাম করে প্রার্থনা জানাল যেন খুশীর অভিনয় আজ সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। খুশী উঠতেই তাকে নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মুখ-হাত ধুয়ে খানিকটা স্কিপিং করল খুশী। দুধ-মিষ্টি খেয়ে কিছুক্ষণ রিহার্সাল দিল মার সামনে। তারপর নাওয়া-খাওয়া সেরে ঘড়ি ধরে দু-ঘণ্টা ঘুম। ঘুম থেকে উঠে সেজেগুজে চারটের আগেই খুশী তৈরী। বিষ্টুদার অপেক্ষা করতে লাগল।

যথাসময়ে বিষ্টুদার গলা পেয়ে খুশী ঢিপ করে মাকে একটা পেন্নাম করে লাফাতে লাফাতে চলে গেল সদর দরজার দিকে। খুশী

বেরিয়ে যেতে, কাজরী জানলা দিয়ে দেখতে লাগল খুশী আর বিষ্ণুর হাত ধরাধরি করে রাস্তা দিয়ে যাওয়া।

খুশী চলে যাবার পর কাজরী ভগবানকে পাঠাল শ্যামাচরণবাবুকে বলে আসতে যে কাল সকালেই খুশীকে নিয়ে সে কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছে—শ্যামাচরণবাবুর সঙ্গে পরে সুবিধেমত দেখা করবে।

'উত্তরায়ণ'-এ খুশীর অভিনয় দেখতে যাবার কোন সংকল্প তার ছিল না। ফাঁকা সময়টা তাই সে কাটাচ্ছিল খুশীর জামাকাপড়, বই, খেলনা গুছিয়ে।

এমন সময় শ্যামাচরণবাবু স্বয়ং এসে হাজির হলেন ভগবানের সঙ্গে। কাজরী ভেতরে ছিল। দরজা খুলে দিয়ে গেল ভগবানের বৌ। ভগবান সুইচ টিপে সন্ধ্যের প্রথম আলো জ্বালল বাইরের ঘরে। তারপর ভাঙ্গা চেয়ারটাতে শ্যামাচরণবাবুকে খাতির করে বসিয়ে কাজরীকে খবর দিতে গেল।

কাজরী এসে শ্যামাচরণবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। শ্যামাচরণবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন কাজরীকে দেখে। তাঁর কল্পনার সঙ্গে মেলেনি কাজরীর থানকাপড় পরা শুকনো চেহারা। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নামই কি কাজরী?'

—'হ্যাঁ।'

—'খুশী যে কাত্তিকের ছেলে তার কোন প্রমাণ তোমার কাছে আছে?'

—'আছে।' বলে কাজরী গলার হারের লকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে শ্যামাচরণবাবুর হাতে দিল।

কাগজটার ভাঁজ খুলে শ্যামাচরণবাবু আনন্দোদ্ভাসিত নেত্রে পড়তে পড়তে বললেন, 'খুশীর বার্থ সার্টিফিকেট! তোমার কাছে ছিল? এ কাগজটার দাম কত জান? আট লাখ টাকা। আমি চাইলুম বলেই আমায় বিশ্বাস করে কাগজটা দিয়ে দিলে?'

কাজরী ম্লান হাসি হেসে বললে, 'মানুষকে যারা বিশ্বাস করে তারাই তো অমানুষ। অমানুষ না থাকলে মানুষ বাঁচবে কি করে বলুন?'

—'খাঁটি কথা বলেছ।' বলে শ্যামাচরণবাবু বার্থ সার্টিফিকেটটা সযত্নে তাঁর মনিব্যাগের একটা খাপে রেখে দিলেন। তারপর বললেন, 'যাক, শোনো। তোমার ছেলে খুশীকে কাত্তিক প্রায় আট লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিয়ে গেছে। 'উত্তরায়ণ' থিয়েটারের মালিকও এখন খুশী। তাছাড়া তোমার জন্যে কিছু মাসোহারার বন্দোবস্ত কাত্তিক করে গেছে। কিন্তু—।' বলে শ্যামাচরণবাবু চুপ করলেন। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে খুশীর কোন শত্রু তার সর্বনাশ করার চেষ্টা করছে। কার কথা বলছি বোধ হয় বুঝতে পেরেছ?' কাজরীর বিস্মিত ও ভীত চোখদুটোর দিকে চেয়ে শ্যামাচরণবাবুর মায়া হল। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে তাঁকে বলে যেতে হল।—'বোঝনি? —দুলাল। দুলাল বরাবরই জানত যে সে ছাড়া তার মামার আর কোন উত্তরাধিকারী নেই। কিন্তু তাঁর যে ছেলে আছে এবং তাকেই তিনি অধিকাংশ বিষয় দিয়ে যাবেন এ কথা দুলাল কল্পনাও করতে পারেনি। দুলাল আমায় শাসিয়ে গেছে যে মামার এই অবিচারের প্রতিশোধ সে নেবে—কেমন করে নেবে তা বলে যায়নি। আমার ওপর নিতে পারে কারণ খুশীকে ফাঁকি দেবার জন্যে আমার সাহায্য চেয়েছিল—আমি রাজী হইনি। আমার ওপর দিয়েই যদি দুলালের গায়ের জ্বালা মিটে যায় দুঃখু করার কিছু থাকবে না। কিন্তু আমার ভয় খুশীকে নিয়ে। দুলালের চরিত্রের কথা আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে মনে হয় তার অসাধ্য কিছু নেই। রাগের মাথায় সে যে-কোন কাজ করে ফেলতে পারে। তাই তোমায় সাবধান করে দিতে এলাম।—বিষয়ের দখল নিতে ঝামেলা হবে না। সময়মত আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তবু তুমি ভগবানের কাছ থেকে আমার নামঠিকানাটা লিখে নিয়ে যেও। কোন রকম বিপদের সম্ভাবনা দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আমায় জানিও। আমার দ্বারা যদি কিছু সম্ভব হয় আমি অবশ্যই

করব।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'আর, যত তাড়াতাড়ি পার খুশীকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। ভগবান বলছিল তুমি এখন কলকাতার বাইরে কোথায় থাক--তাহলে তো ভালই—খুশীকেও সেইখানে নিয়ে গিয়ে এখন কিছুদিন নিজের চোখে চোখে রাখ।'

কাজরী এবার করুণভাবে বললে, 'আমার একটা কথা বলবার ছিল।'

—'বল।'

—'আমি কাল সকালেই খুশীকে নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে যাব। বিষয়ের ওপর আমার লোভ নেই। যদি বিষয় পেয়ে দুলালবাবু সন্তুষ্ট হন সমস্ত বিষয় আমি তাঁর নামে লিখে দিতে রাজী আছি।'

—'তা বললে কি হয়? বিষয় খুশীর। খুশী নাবালক। তার বিষয় দান করার অধিকার তো তোমার নেই!'

এই বলে শ্যামাচরণবাবু বেরিয়ে গিয়ে তাঁর মোটরে উঠতে যাচ্ছিলেন, কাজরী হঠাৎ ছুটে এসে মোটরের পাশে দাঁড়াল। বললে, 'আপনি এত করলেন, আমার আর একটু উপকার যদি করেন—।'

—'কী? বল।'

—'আমায় 'উত্তরায়ণ'-এ নাবিয়ে দিয়ে যান। দেখি যদি খুশাকে নিয়ে আজ রাত্তিরেই চলে যেতে পারি।'

শ্যামাচরণবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কেন? খুশী কি থিয়েটার দেখতে গেছে? কার সঙ্গে গেল? তুমি তাকে একলা ছেড়ে দিলে? আমি ভেবেছিলুম তুমি চালাক-চতুর চৌখস মেয়ে, এখন দেখছি তুমি একেবারে সাধাসিধে। জানিনা তুমি এ বিপদ থেকে কী করে উদ্ধার পাবে! যাক—চল তোমায় 'উত্তরায়ণ'-এ পৌঁছে দিই।' বলে তিনি গাড়ির দরজা খুলে দিলেন।

সাতাশ

কাজরীকে 'উত্তরায়ণ'-এ নামিয়ে দিয়ে শ্যামাচরণবাবু চলে গেলেন।

'উত্তরায়ণ'-এর সামনে তখন অসম্ভব ভিড়। 'হাউস ফুল' লেখা বোর্ডখানা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। টিকিট-ঘরের মাথায় বড় চৌকো ঘড়িটার কাঁটাদুটো প্রায় এক হয়ে এসেছে। সাড়ে ছটায় অভিনয় আরম্ভ হবে।

ভিড় দেখে কাজরী কয়েক মুহূর্তের জন্যে জড়সড় হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল জনতার মধ্যে অনেকে হয়ত চিনে ফেলবে তাকে। কিন্তু বুঝতে তার দেরি হলনা যে 'উত্তরায়ণ'-এর গতকালের নায়িকা থানকাপড় পরে আজ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে স্তুতির দৃষ্টি তার দিকে ফেরবার কথা নয়—আজকের স্তুতি শুধু তারই জন্যে তোলা আছে যে রঙ্গমঞ্চকে একটু পরেই আলোকিত করবে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কাজরী ধীরে ধীরে ভিড় কাটিয়ে পাশের গলিতে 'উত্তরায়ণ'-এর ছোট দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা অল্প খোলা রেখে একজন দরোয়ান পথ আগলাচ্ছিল। নতুন মুখ—কার্তিকবাবুর আমলের লোক সে নয়। তার চেহারা দেখে কাজরী খানিকটা দমে গেল। তবু সাহস করে তাকে এগিয়ে যেতে হল। দরোয়ানজীকে আবেদন জানাতে হল—'আমায় একবার ভেতরে যেতে দেবে ?'

দরোয়ানজী কাজরীকে দেখে বুঝতে পারলেন না যে আওরতটি কতখানি সম্মানের যোগ্য। দিকনির্দেশ করে বললেন, 'টিকিসঘর সামনে আছে।'

কাজরী মর্যাদার বালাই না করে বললে, 'আমি থিয়েটার দেখতে

আসিনি। বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকার আছে। আমায় তাঁর কাছে একবার নিয়ে যাবে ?'

দরোয়ানজী হেসে উঠলেন। গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'আজ তো দোরকার হোবেই। লেকিন হামার মালিক হুকুম দিয়েছেন কি আজ কোই বাহারকা আদমী ভিত্‌রে যেতে পারবে না।'

কাজরী এতেও ধৈর্য হারাল না। তার সময় নেই মান-অপমানের কথা ভাববার। তাকে ভেতরে যেতেই হবে। খুশীকে বাঁচাতে হবে দুলালের দৃষ্টি থেকে। নিজেকে সংযত করে কাজরী তাই আর একবার বলল, 'বেশ, আমাকে যেতে না দাও, আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি—তুমি কি বিষ্ণুবাবুকে একবার খবর দিতে পারবে যে কাজরীদেবী তাঁকে ডাকছেন ?'

'কাজরী' নামটা দরোয়ানজীর অপরিচিত নয়। এবার তিনি যেন একটু ইতস্ততঃ করে একজন বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'এই গুণমণি, শুন্।'

গুণমণি এগিয়ে আসতে দরোয়ানজী বললেন, 'বিষ্টুবাবুকে খবর দিতে হোবে যে এক আওরত তাঁকে বুলাচ্ছেন।'

গুণমণি বললে, 'তোমার কি মাথা খারাপ ? বিষ্টুবাবু এখন ইষ্টেজের মধ্যে চলে গেছেন। আমি কি ইষ্টেজের ভিতর গিয়ে তাঁকে খবর দিব ?'

দরোয়ানজী গুণমণির যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। মুখ বাড়িয়ে কাজরীকে বললেন, 'বিষ্টুবাবু ইষ্টেজে চলে গেছেন।'

কাজরী বললে, 'তাহলে গুণমণিকে বল দুলালবাবুকে একবার খবর দিতে।'

গুণমণি নিজের নাম শুনে দরজার ফাঁকে মাথা গলাল। আশা করেনি যে তার মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে কাটা যাবে। দরোয়ানজীকে ঠেলা মেরে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে সে সানুনয় অভ্যর্থনা জানাল কাজরীকে—'আসুন, ভিতরে আসুন, আজ্ঞে। আপনি এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন ?'

কাজরী ভেতরে ঢুকতে গুণমণি একটা চেয়ার তুলে এনে নিজের

কাপড় দিয়েই সেটা ভাল করে ঝেড়ে পুঁছে বলল, 'বসুন—আমি ছোটবাবুকে এখনই খবর দিয়ে আসছি।'

গুণমণির খাতিরের বহর দেখে দরোয়ানজী একটা ঢোঁক গিলতে বাধ্য হলেও মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলেন। এর ওপর মনিবকে ছোটবাবু বলার বেয়াদপি তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। বলে উঠলেন, 'ছোটাবাবু নেহি, বড়াবাবু বোলো।'

গুণমণি দরোয়ানজীর দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেল।

দুলালের ঘরের সামনে গিয়ে গুণমণির কেমন কেমন লাগল। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। দুলালবাবুর খাস বেয়ারা মদন বাইরে পাহারা। ছুঁচলো গোঁফের নীচে মুখটা ছুঁচলো করে মদন বললে, 'ভেতরে জরুরী বৈঠক বসেছে—এখন যাও। ঘণ্টাখানেক পরে এস।'

গুণমণি আজকের লোক নয়। মদনকে গ্রাহ্য করল না। টুক টুক করে দরজায় টোকা দিল।

দুলাল বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'কে?'

গুণমণি উত্তর দিল—'আমি, আজ্ঞে—গুণমণি। কাজরীদিদি এসেছেন। আপনাকে ডাকছেন।'

শুনে দুলাল চুপ করে রইল। খানিক বাদে বলল, 'বল্, আমি দু-মিনিটের মধ্যে আসছি—এখনই আসছি—দেখিস যেন চলে না যান।'

গুণমণি মদনের দিকে কদলীদর্শনের চাউনি চেয়ে চলে গেল।

দুলালের ঘরের ভেতর যে জরুরী বৈঠক বসেছিল তা এক ষড়যন্ত্রের। 'দিন আগত ঐ' নাটকের উদ্বোধনটাও সেই একই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। দুলাল ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিল যে অভিনয়ের এক অঙ্ক শেষ না হতেই ষ্টেজে আগুন লাগবে। হট্টগোল বাড়ানর জন্যে দর্শকদের অনুরোধ করা হবে টিকিটের দামটা তাঁরা যেন আজই ফেরত নিয়ে যান

দয়া করে। এদিকে খুশী অজ্ঞান হয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবার নাম করে তাকে কলকাতা থেকে রওনা করে দেওয়া হবে মোটরে।

হঠাৎ কাজরীর আগমনবার্তা পেয়ে দুলাল তার অনুচরদের দিকে চেয়ে হাসবার চেষ্টা করল। দেখাতে চাইল যে সে ভয় পায়নি। ভয়ের কী আছে? কাজরীকে ধোঁকা দেওয়া কিছু নয়। তবে দেখতে হবে কাজরী সন্দেহ করে আগেই কোন সাবধানতা অবলম্বন করেছে কিনা।

দুলাল ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। তারপর বলল, 'আমাদের প্ল্যানটা একটু বদলাতে হবে। আমিই খুশীর ভার নেব। খুশী আর চন্দনাদেবী দুজনকে নিয়ে আমি আমার গাড়িতে রওনা হব। হরি সিং আমার সঙ্গে থাকবে।—কাজরীদেবীকে আমি এখনই স্পেশাল বক্সে বসাবার ব্যবস্থা করে আসছি। স্টেজে আগুন লাগার পর তাঁকে বক্সের বাইরে আসতে দেওয়া হবে না। তাঁকে উদ্ধার করবেন বিষ্টুবাবু। —আমি ওঁদের চোখের সামনে দিয়ে খুশী আর চন্দনাদেবীকে নিয়ে রওনা হব। ওঁরা পেছু নেবেন কালুর ট্যাক্সিতে। বাঞ্ছারাম কালুর সঙ্গে থাকবে। ওঁদের সঙ্গে যদি পুলিস বা অন্য কেউ থাকে তবে মাঝরাস্তায় ট্যাক্সি খারাপ হয়ে যাবে বা ভুলপথে ওঁদের নিয়ে যাবে। আর তা না থাকলে ট্যাক্সি আমার গাড়ির পেছু পেছু আসবে—কালু আর বাঞ্ছারাম ভরসা দেবে যে আমায় ওরা যেমন করে হোক ধরবেই—পালাতে দেবে না। তারপর আমাদের দেখা হবে জলাপুকুরের লেভেলক্রসিং পার হয়ে।'

এবার কালুর দিকে চেয়ে দুলাল বললে, 'তবে খবরদার। কোন রকম খুনখারাপি হয় না যেন। যদি ওঁরা আমায় ধরতে না চান, যেখানে বলবেন পৌঁছে দিও। থানায় যেতে চান থানাতেই নিয়ে যেও। আমার জন্যে ভেবনা। তোমাদের ট্যাক্সি দেখতে না পেলে আমি অন্য ব্যবস্থা করব।'

বৈঠক ভেঙে দিয়ে দুলাল চলে গেল কাজরীর সঙ্গে দেখা করতে।

কাজরী গুণমণির পেতে দেওয়া চেয়ারেতে চুপচাপ বসেছিল। দূর থেকে তার বিধবাবেশ দেখে দুলালের ঠোঁটের রেখা বেঁকে উঠেছিল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে হন হন করে কাজরীর দিকে এগিয়ে গেল। গদ গদ হয়ে বললে—'আজকের দিনে তুমি এসেছ, এ 'উত্তরায়ণ'-এর পরম সৌভাগ্য—-আমাদের সকলকার সৌভাগ্য।—চল, তোমার বসবার একটা ব্যবস্থা করে দিই।'

কাজরী আমতা আমতা করে বললে, 'আমি থিয়েটার দেখব বলে আসিনি। বিষ্ণুবাবুকে একটা জরুরী কথা বলতে এসেছিলাম।'

দুলাল অত্যন্ত ধীর গলায় বলল, 'বেশ তো—তুমি বরঞ্চ ততক্ষণ ওপরে স্পেশাল বক্সে বসবে চল। প্রথম অঙ্কের পরেই আমি বিষ্ণুকে পাঠিয়ে দেব। আর তেমন জরুরী কোন কথা হয় তো আমায় বলতে পার, আমি ওকে এখনই জানিয়ে দিচ্ছি।'

কাজরী থতমত খেয়ে বলল, 'না – তেমন কিছু নয়। আমি কালই কলকাতার বাইরে চলে যাব—তাই একটা কথা বলতে এসেছিলাম।'

কাজরীকে এবার উঠে দাঁড়াতে হল। দুলালের সঙ্গে যেতে হল স্পেশাল বক্সে। দুলাল সমাদরের ত্রুটি রাখল না। রাংতা মোড়া পান আর লেমোনেড আনাল। কাজরী ছোঁবে না সে জানত। একটু পরেই দুলাল চলে গেল। তার আজ অনেক কাজ।

অভিনয় চলছিল। শান্তা আর বিষ্ণু এল, গেল। কাজরী নতুন করে বুঝল অভিনয় করা আর অভিনয় দেখার পার্থক্য। কিন্তু তার ভাল লাগছিল না শান্তার অভিনয়। অমন ভাবে কেউ তাকায় নাকি পরপুরুষের দিকে? আর বিষ্ণুর এত কাছে দাঁড়িয়ে সে কথা বলছে—দৃষ্টিকটু হচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না।

দৃশ্য বদলাতে খুশী অবতীর্ণ হল। কাজরী থরথর করে কাঁপতে লাগল খুশীর বাঁশীর মত গলা শুনে। খুশীর অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয় দেখে সে আর স্থির থাকতে পারছিল না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে খুশীকে বুকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু আজ তার অধিকার নেই রঙ্গমঞ্চে যাবার।

তার জায়গা দখল করেছে শান্তা। যেন খুশীকেও ছিনিয়ে নিয়েছে তার বুক থেকে। খুশী এমন করে 'মা' বলে ডাকছে যেন শান্তাই তার আসল মা।

খুশীকে নিয়ে সে আজ পারলে আজই পালিয়ে যাবে। শুধু দুলাল নয়, শান্তার হাত থেকেও তাকে বাঁচাতে হবে।

কাজরী ভাবছিল কখন প্রথম অঙ্ক শেষ হবে। বিষ্ণু এসে অবাক হয়ে যাবে তার বেশ দেখে। এখন সে দু-একবার এদিকে তাকাচ্ছে কিন্তু চিনতে পারছে না। খুশীও কি চিনতে পারছে না? না চিনেছে ভালই। চিনলে হয়ত আর সহজভাবে অভিনয় করতে পারবে না। বারে বারে তাকিয়ে ফেলবে মার দিকে। বিষ্ণু আর শান্তা তখন সন্দেহ করবে। তারাও তাকাবে। তারপর নিশ্চয় চিনতে পারবে। তখন শান্তা বুঝতে পারবে যে সে যা সেজেছে তা নকল। যা আনন্দ পাচ্ছে তাও নকল।

ভাবতে ভাবতে কাজরী অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তার কানে এল চেঁচামেচির আওয়াজ—অনেকগুলো কণ্ঠের একসঙ্গে চিৎকার—'আগুন! আগুন!' কাজরী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। দেখল সত্যিই ষ্টেজে আগুন ধরেছে। আগুনের লেলিহান শিখা দৃশ্যপটকে আক্রমণ করেছে দু-ধার থেকে।

আর্তনাদে সারা বাড়িটা গমগম করতে লাগল। দেখতে দেখতে রঙ্গমঞ্চ ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। কুণ্ডলী পাকিয়ে সেই ধোঁয়া বড় হতে হতে দানবের মত এগিয়ে আসতে লাগল প্রেক্ষাগৃহকে গ্রাস করতে। দানবের হাত থেকে পালানর জন্যে রীতিমত যুদ্ধ বেধে গেল দর্শকদের মধ্যে। বেশভূষা, অর্থ, অঙ্গ কিছুরই মায়া রইল না। আপনি বাঁচলে তুমি। আত্মরক্ষা আগে, দারৈরপি ধনৈরপি!

কিন্তু অত গোলমালের মাঝখানেও কাজরী যেন শুনতে পেয়েছিল খুশীর চিৎকার। সে পাগলের মত ছুটে গেল দরজার দিকে। গিয়ে দেখল দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে কে শেকল তুলে দিয়েছে!—হঠাৎ কাজরীর মনে হল যে এ সবই দুলালের কাজ—খুশীকে বিপদে ফেলার ফাঁদ।

কাজরী আর ভাবতে পারল না। তার মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। অস্ফুট শব্দ করে সে বক্সের ভেতর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

শান্তা আর খুশীকে নিয়ে বিষ্ণু স্টেজ থেকে বেরতেই দুলাল বিষ্ণুকে আড়ালে ডেকে বলল, 'মহা বিপদ হয়েছে—আজ আবার কাজরী এসেছে তোমাদের থিয়েটার দেখতে—সে একলা স্পেশাল বক্সে বসে আছে। তুমি বরঞ্চ তাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে যাও, আমি চন্দনাদেবী আর খুশীকে পেছনের দরজা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

বিষ্ণু দুলালের কথাটা ভাল ভাবেই নিল। জনসমুদ্রে সাঁতার কেটে ওপরে যাবার সিঁড়ির দিকে এগোল। শান্তা আর খুশীর ভার দুলাল যদি নিতে পারে তবে কাজরীকে সে নিরাপদে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে ঠিকই।

দুলাল শান্তা আর খুশীকে প্রায় টেনে নিয়ে চলেছিল পেছনের দরজার দিকে।

শান্তা একবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বন্ধু কোথায় গেলেন ?'

দুলাল গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, 'এমন কাউকে উদ্ধার করতে যার প্রাণকে সে আপনার প্রাণের চেয়ে বেশী মূল্যবান বলে মনে করে।'

স্পেশাল বক্সের সামনে পৌঁছতে বিষ্ণু ঘেমে নেয়ে উঠেছিল। তার পাঞ্জাবিটার আর পদার্থ ছিল না। বক্সের ভেতর ঢুকে মুক্তি পেতে গিয়ে দেখল দরজার বাইরে শেকল তোলা! বিষ্ণু আর একবার ঘাড় তুলে পড়ল 'স্পেশাল বক্স' লেখাটা।—তাহলে কী দুলাল ধাপ্পা দিল ?

কী ভেবে বিষ্ণু শেকল খুলে ভেতরে পা বাড়াল। সিঁড়ির একটা ধাপ নামতেই সে থ হয়ে গেল। চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারল না যে সিঁড়ির নীচে যে নারীদেহ লুটিয়ে রয়েছে তা কাজরীর। —কাজরী বিধবা ?

বিষ্ণু কী করবে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। কাজরী বেঁচে

আছে কিনা তাই বা কে জানে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ে বিষ্ণু কাজরীর মাথাটা তুলে হেলান দিয়ে দিল। না—বেঁচেই আছে সে—জোর আঘাত লাগেনি। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু চলে গেল জলের খোঁজে। অতি কষ্টে এক গেলাস জল যোগাড় করে এনে কাজরীর মুখে জলের ছিটে দিল, জলহাত বুলিয়ে দিল কপালে, চোখে, কানের পাশে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজরীর জ্ঞান হল। চোখের পাতা খুলে সে অন্ধের মত চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ যেন বিষ্ণুকে চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি উঠে বসবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দুর্বল হাতদুটো দিয়ে আগেই সামলাতে গেল এলোমেলো কাপড়খানা।

বিষ্ণু কাজরীকে দু-হাতে ধরে আস্তে আস্তে বসিয়ে দিল একটা চেয়ারে। গেলাসটা তার মুখের ওপর ধরতে সে ঢক ঢক করে বাকী জলটুকু খেয়ে নিল। কাজরী তখনও ভাল করে বুঝতে পারেনি সে কোথায়। বিষ্ণুর দিকে চেয়ে একবার ক্ষীণকণ্ঠে শুধু বলল—'খুশী কই?'

বিষ্ণু প্রশ্নটা কানে নিল না। বললে, 'ষ্টেজে আগুন লাগতে ভয় পেয়ে গিয়েছিলে বুঝি? আগুন তো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। আজ অবিশ্যি থিয়েটার আর হবে না। ভিড়টা একটু কমলেই তোমায় নিয়ে যাচ্ছি, চল।'

কাজরীর মুখ থেকে ভয়ের কালশিটে গেল না। সে আবার সেই একই প্রশ্ন করল, 'খুশী কই?'

—'খুশী আর শান্তাকে দুলাল বাইরে নিয়ে গেছে। তোমায় নিয়ে যাবার জন্যে আমি এলাম।'

কাজরী তাই শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। যেন পাগল।

বিষ্ণু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'অমন করছ কেন? তোমার কি কোথাও লেগেছে? কষ্ট হচ্ছে?'

কাজরী ঘাড় নেড়ে বলল, না।

—'তবে?'

কাজরী হঠাৎ বিষ্ণুর ডান হাতটা দু-হাতে চেপে ধরে বললে, 'তোমার

পায়ে পড়ি, খুশীকে বাঁচাও। দুলাল তাকে—।' কথা শেষ না করেই কাজরী আবার কেঁদে উঠল।

বিষ্ণুর সন্দেহ হল, কাজরীর মাথা খারাপ হয়নি তো? তাই হয়ত সে আধ-ময়লা থানকাপড় পরে চলে এসেছে 'উত্তরায়ণ'-এ। তাই বোধহয় দুলাল বক্সের বাইরে শেকল তুলে দিয়ে চলে গেছে। বিষ্ণু ঘাবড়ে গেল। ধমক দিয়ে বলে উঠল—'কী আজেবাজে বকছ? খুশীকে বাঁচাবার কী আছে? দুলাল তাকে বিপদ থেকে বাঁচানর জন্যেই তো বাইরে নিয়ে গেছে। শান্তাও সঙ্গে আছে। তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন?'

কাজরী আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললে, 'তুমি জাননা দুলালের সব কথা; আজকের এ সব গণ্ডগোল সে ইচ্ছে করে পাকিয়েছে শুধু খুশীর অনিষ্ট করবার জন্যে। সে যে খুশীকে আগুনের মধ্যে ঠেলে ফেলে দেয়নি এই ঢের।'

বিষ্ণু এখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না কাজরীর কথাগুলো। বললে, 'যদি তা সত্যি হয়, অনেক আগেই তুমি আমাকে সব কথা জানাতে পারতে। খুশীর থিয়েটার করা নিয়ে যখন আপত্তি তুলেছিলে তখনই সব কিছু স্পষ্ট করে লিখতে পারতে। যাই হোক আমি একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারছি না—খুশী তোমার কে?'

—'আমার ছেলে।'

বিষ্ণু হতবুদ্ধি হয়ে কিছুক্ষণ কাজরীর আলুথালু চেহারার দিকে চেয়ে রইল। তার জিজ্ঞেস করার দরকার হলনা, খুশীর বাবা কে? বলল, 'খুশীকে বাঁচাবার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব, তোমায় কথা দিলাম। এখন ওঠো।'

কাজরী উঠে দাঁড়াতে বিষ্ণু তাকে ধরে ধরে বক্সের বাইরে নিয়ে গেল। আগুন নিভে গেলেও ধোঁয়ার উপদ্রব তখনও যায়নি। সিঁড়ির তলায় যথেষ্ট ভিড়।

ভিড়ের ভেতর দিয়ে বিষ্ণু কাজরীকে সাবধানে নিয়ে যাচ্ছিল

বাইরের দিকে। কে যেন সেই সময়ে তার নাম ধরে দুবার ডাকল। বিষ্ণু ঘাড় ফিরিয়ে জনতার মধ্যে পরিচিত কাউকে দেখতে পেল না।

যিনি বিষ্ণুকে ডেকেছিলেন তিনি শান্তার দিদিমা। আজও এসেছিলেন লুকিয়ে লুকিয়ে শান্তার অভিনয় দেখতে। বসেছিলেন ঠিক স্পেশাল বক্সের পাশেই। কাজরী, দুলাল, বিষ্ণু সবাইকে তো দেখেছিলেনই, এমনকি বিষ্ণু আর কাজরীর কথাও খানিক খানিক তার কানে এসেছিল। সব কথা না বুঝলেও তিনি ইঙ্গিত পেয়েছিলেন যে আজকের আগুন লাগাটা দুলালের ষড়যন্ত্র, আর খুশীর জীবন দুলালের হাতে নিরাপদ নয়।

শান্তার জন্যে তাই তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এবং বিষ্ণুর সাহায্য চেয়েছিলেন শান্তার খোঁজ করে তাকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাবেন বলে।

বিষ্ণুকে ধরতে না পেরে দিদিমা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তারপর কোনমতে ভিড় ঠেলে তিনি যখন বাইরে এসে পৌঁছলেন, দেখতে দেখতে কয়েকটা ঘটনা অদ্ভুতভাবে একসঙ্গে ঘটে গেল।

দিদিমা দূর থেকে দেখতে পেলেন দুলালের সাদা গাড়িতে শান্তা আর খুশী পেছনের সিটে বসে আছে। দুলালের পাশে এক দরোয়ান। কাজরী আর বিষ্ণু দুলালের গাড়ির দিকে ছুটে যেতে দুলাল যেন দেখেও দেখল না। গাড়ি চালিয়ে দিল। কোথা থেকে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল ঠিক কাজরী আর বিষ্ণুর সামনে। তারা সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সিতে চেপে রওনা হল। মনে হল দুলালের গাড়ির পেছু নেবে।

দিদিমা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি ঘরের গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বললেন, মহীপাল, 'দিদিমণিকে দেখতে পেয়েছিলে?' মহীপাল বললে যে সে দিদিমণিকে একটা সাদা গাড়িতে উঠতে দেখেছে। দিদিমা উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন, 'ঐ গাড়িটা ধরতে পারবে? সম্ভবতঃ ঐ গাড়িটার পেছন পেছন একটা ট্যাক্সিও দেখতে পাবে।'

মহীপাল আর এক মুহূর্ত দেরি না করে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

কিছুদূর যেতেই দুলালের গাড়ি আর ট্যাক্সি দুটোই দেখতে পাওয়া গেল। কিন্তু ভয়ের কারণ যে দুলাল শাস্তাদের বাড়ির দিকে না গিয়ে উলটো রাস্তায় যাচ্ছে। দুলালের মোটর শ্যামবাজার হয়ে ব্যারাকপুরের দিকে বেঁকে গেল।

মহীপাল দিদিমাকে বললে যে তার ভয় হচ্ছে সাদা গাড়িটা কলকাতার বাইরে কোথাও যাবে। গাড়িতে এখনও তিরিশ-চল্লিশ মাইলের মত তেল আছে। তবে দিদিমা কি একলা অন্ধকার রাস্তায় গাড়ি দিতে সাহস করবেন?

দিদিমা একবার চোখ বুজলেন। হয়ত ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। তিনি মহীপালকে বললেন, 'দেখ, এক কাজ কর। ফাঁকা রাস্তায় পৌঁছবার আগে ইচ্ছে করে একটা গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়ে দিয়ে এমনভাবে পালাও যাতে সবাই হৈ-হৈ করে তোমায় ধরতে আসে। পারবে?'

মহীপাল হটে গেলনা। খানিকদূর গিয়ে গাড়িটা সর্পিল গতিতে চালাতে চালাতে রাস্তার বাঁ-পাশে দাঁড়ান অন্য একটা গাড়িতে ধাক্কা মারল। আর লোকজনের চেঁচামেচি শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির টাল সামলে নিয়ে জোরে বেরিয়ে গেল ফাঁকা রাস্তার দিকে।

দিদিমা যা চাইছিলেন তাই হল। পথিকদের গালাগালি আর হল্লাতে ধাক্কা খাওয়া গাড়িটার চারপাশে বেশ একটা বড় জনতা জমায়ত হল। পুলিসের খোঁজ করতে করতে একটা জিপও এসে দাঁড়াল কয়েক মিনিটের মধ্যে। কয়েকজন নয়নসাক্ষী উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে গেলেন পুলিস অফিসারের কাছে—ফলাও করে বলতে লাগলেন ঘটনাটা। মূলসাক্ষী বললেন, 'আমি স্পষ্ট দেখলুম গাড়ির ভেতর একটি সুন্দরী তরুণী ড্রাইভারকে কাকুতি-মিনতি করে কী বলছেন, আর ড্রাইভার ব্যাটা নেশায় চুর হয়ে সমানে বকবক করছে। এই করতে করতে ব্যাটা দড়াম করে মারলে এই গাড়িটায় ধাক্কা, জানেন? তারপর ফুলস্পীডে একেবারে পগার পার।—ঐ দিকে। বোধ হয় আজ রাত্তিরেই কাশী পৌঁছে যাবে।'

পুলিস অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, 'গাড়ির নম্বরটা মনে আছে ?'

মূলসাক্ষী বললেন তাঁর তখন নম্বর দেখবার মতন মনের অবস্থা ছিলনা। তবে ধাক্কা খাওয়া গাড়ির ড্রাইভার একটা নম্বর বললেন যেটা একেবারে নির্ভুল না হলেও গাড়ির সন্ধান পেতে সাহায্য করবে।

—'রং ?'

—'কালো।'

—'কী গাড়ি ? মানে, ডজ, না ফোর্ড না হাম্বার—।'

—'অস্টিন—অস্টিন।' বলে একটি তের-চোদ্দ বছরের ছেলে এগিয়ে এল।

—'ঠিক জান ?'

—'হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমাদের পাড়ায় মোতিবাবুদের ঠিক ঐ রকম একটা গাড়ি আছে।'

সকলকার বিবৃতি থেকে যথাসম্ভব সত্যটুকু ছেঁকে নেবার চেষ্টা করে পুলিস অফিসার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে একজন মহিলাযাত্রীকে নিয়ে এক দুঃসাহসী ড্রাইভার ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে পলায়ন করেছে—এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তার উদ্দেশ্য সাধু নয়। আর দেরি না করে তিনি তাই নারী অপহারীকে ধরবার জন্যে যাত্রা করলেন।

পুলিস অফিসারের সঙ্গে ড্রাইভার ছাড়াও আর একজন পুলিস কর্মচারী ছিল। মাঝে মাঝে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তাদের সাহায্যে পুলিস অফিসার খোঁজ নিচ্ছিলেন পলায়মান কালো অস্টিন গাড়িটার। ক্রমশঃ বুঝতে পারা গেল গাড়িখানা বালিব্রীজ পার হয়ে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরেছে। আরও খানিকটা যাবার পর এক ফাঁড়ির চৌকিদার বলল যে দশ-পনের মিনিটের মধ্যে তিনটে গাড়িকে সে খুব জোরে চলে যেতে দেখেছে—প্রথমটি সাদা, দ্বিতীয়টি ট্যাক্সি এবং শেষেরটি কালো।

পুলিস অফিসারের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। কর্মচারীটিকে জিজ্ঞেস করলেন—'কী বুঝছ ?'

—'ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে স্যার!'

ড্রাইভার বললে, 'ফাঁড়িসে এক দো আরমড্‌গার্ড সাথ লে লেনেসে আচ্ছা হোতা।'

অফিসার বললেন, 'দরকার নেই। আমাদের সঙ্গে দুটো রিভলবার আছে—ওতেই হবে।'

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ফাঁকা রাস্তায় গাড়ির স্পীড হু হু করে বেড়ে যেতে শান্তা দুলালকে আর বিশ্বাস করতে পারল না। প্রথমে দুলাল বলেছিল শ্যামবাজারের দিক একটা জরুরী কাজ সেরেই সে শান্তা আর খুশীকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তারপর বলল তেল ফুরিয়ে গেছে—একটু এগিয়ে গেলেই পেট্রল-পাম্প পাবে, সেখান থেকে তেল নিয়ে গাড়ি ঘোরাবে। একটা পেট্রল-পাম্প পথে পেয়েও দুলাল তেল নিলনা। বললে, যে পেট্রল সে ব্যবহার করে তা এ পাম্পে নেই।

শান্তা শেষকালে মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'আপনি গাড়ি থামান—আপনাকে আমার আর বিশ্বাস হচ্ছে না।'

দুলাল হেসে উঠল—'আপনি কি গাড়ি থেকে নেবে যেতে চান? কোথায় যাবেন? কিসে যাবেন?'

—'সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি যেমন করে হোক খুশীকে নিয়ে বাড়ি চলে যাব।'

—'খুশীকেও নিয়ে যাবেন? কেন? খুশীকে নিয়ে যাবার অধিকার আপনাকে কে দিল?'

—'নয়তো কি খুশীকে আপনার হাতে একলা ছেড়ে চলে যাব?'

—'তাইতো আপনাদের দুজনকেই একসঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ভয় নেই—একটু পরেই অনেক রহস্য আপনার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে। তখন খুশীর ওপর আপনার আর কোন মায়া থাকবে না।'

রাস্তা আরও অন্ধকার আর নির্জন হয়ে আসতে লাগল।

শান্তা আর থাকতে পারল না। দরজার কব্জাটা শক্ত করে ধরে বললে, 'আপনি যদি গাড়ি না থামান আমি দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ব।'

দুলাল আবার হাসল।—'তাতে আপনার লাভ হবে না—খুশীরও না। ভেবে দেখুন না। এই ঘুট ঘুটে অন্ধকারে রাস্তার ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকাটা আপনার পক্ষে খুব নিরাপদ হবে কি? তার চেয়ে চুপচাপ বসে থাকুন। আমি গাড়ি থামাব একেবারে জলাপুকুরের লেভেলক্রসিং পার হয়ে। আর মাত্র ঘণ্টা খানেক। তখন আপনি যা কৈফিয়ত চাইবেন দেব। আপনাকেই বিচার করতে বলব। আপনার হুকুম শিরোধার্য করে নেব। এর পরে আপনার কিছু বলবার নেই তো?'

শান্তা চুপ করে রইল। খুশী ভয়ে জড়সড় হয়ে শান্তার কোল ঘেঁষে বসেছিল। চন্দনাদি আর কোন কথা বলছেন না দেখে সে আরও ভয় পেয়ে গেল। নিরাশ হয়ে ফোঁপাতে লাগল চন্দনাদির হাতে মাথা ঠেকিয়ে।

খুশীর ফোঁপানি শুনে দুলাল অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'ফের যদি কান্নার আওয়াজ পাই আমি ওর গলা টিপে রাস্তার নর্দমায় ফেলে দিয়ে যাব।'

এ কথা শুনে খুশীর ফোঁপানি বন্ধ হওয়া দূরে থাক, সে একেবারে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠল। শান্তা তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে দুলালকে বলল, 'ছি-ছি। আপনি কি মানুষ?'

দুলাল জোরে হেসে উঠল। যে হাসি হাসল তা মানুষের হাসি নয়। হাসির সঙ্গে বিড়বিড় করে কী বলল বোঝা গেল না।

শান্তার বুক দুরদুর করে উঠল। খুশীকে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। খুশীর কান্না আস্তে আস্তে থেমে যেতে লাগল। তার চোখদুটো স্নেহের স্পর্শে বুজে এল। খানিক পরে শান্তার কোলে মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তীব্র হেডলাইট জ্বেলে মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক হর্ণ বাজিয়ে দুলালের গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। শান্তা নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে। তার মনে

হতে লাগল ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। হঠাৎ শান্তার খেয়াল হল ডুলাল গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়েছে। হেডলাইটের আলোয় সে দেখতে পেল সামনে একটা লেভেলক্রসিং। এই কি জলাপুকুরের লেভেলক্রসিং?

গেট খোলা ছিল। ডুলালের গাড়ি রেল-লাইন পেরিয়ে ফাঁকা মাঠের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

ডুলাল গাড়ি থেকে নামল। শান্তাও নামল। তার হাত-পায়ে খিল ধরে গেছে। এখন শান্তার আর তত ভয় করছে না। এতক্ষণ যে অন্ধকারকে ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছিল, ফাঁকা মাঠের ওপর তা যেন ছড়িয়ে গেছে—এখন তাকে কমনীয় মনে হচ্ছে। আকাশে অসংখ্য তারা। বুঝোতে চাইছে যে রাত আর অন্ধকার এক নয়। অন্ধকার কালো কুচকুচে, রাত নীলাঙ্গী।

যেখানে ডুলালের গাড়ি দাঁড়াল তার আশপাশে বসতির কোন চিহ্ন নেই। চারিদিকে চাইলে মোট দুটি নকল আলো চোখে পড়ে—একটি সিগনালের মাথায়—অপরটি পয়েণ্টসম্যানের ঘরে। সিগনালের আলোটা লাল থেকে সবুজ হল। একটা ট্রেন আসবে। ডুলাল ব্যস্ত হয়ে উঠল। এখনও কাজরী আর বিষ্ণুকে নিয়ে ট্যাক্সি কেন পৌঁছল না? পয়েণ্টসম্যানের ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। লণ্ঠনটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গেটের কাছে গিয়ে থামল। গেট বন্ধ হয়ে গেল। লণ্ঠনটা দাঁড়িয়ে রইল।

ডুলাল ঝকঝকে সিগারেট-কেস আর লাইটার বার করে সিগারেট ধরাল। আর একটা আলো বাড়ল। কেস আর লাইটার পকেটে রেখে ডুলাল আর একটা ঝকঝকে জিনিস বার করল। শান্তাকে দেখিয়ে হাতের ওপর নাচাতে লাগল সেটাকে। অন্ধকারেও চিনতে ভুল হলনা শান্তার—রিভলবার। শান্তা শিউরে উঠল। ডুলাল হেসে বললে, 'এটা শুধু ভয় দেখানর জন্যে।'

শান্তা কুঁকড়ে গিয়েছিল রিভলবার দেখে। বললে, 'কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? আমাকে?'

—'না। এখনও ভয় দেখাইনি।—আগে বলি আপনাকে কী জন্যে এতদূর টেনে আনলাম।'

সিগারেটে একটা গভীর টান দিয়ে দুলাল অনেকখানি ধোঁয়া ছাড়ল রুখে রুখে। তারপর বললে, 'আমার মাতুল ওরফে কার্তিকবাবু অনেক টাকার বিষয় রেখে মারা গেছেন। কিন্তু—।' দুলাল থামল। 'কিন্তু, আমাকে—বলতে গেলে কিছুই তিনি দিয়ে যাননি।'

—'উত্তরায়ণ ?'

—'না। আমি 'উত্তরায়ণ'-এর মালিক সেজে বেড়াচ্ছি। 'উত্তরায়ণ'-এর বর্তমান মালিক—।'

—'কে ?'

—'মামার এক অবৈধ সন্তান, যাকে তিনি বার আনা সম্পত্তি দান করে গেছেন।'

—'বলেন কি !' শান্তা চমকে উঠল।

—'হ্যাঁ। আপনি আরও আশ্চর্য হবেন শুনে যে সেই সন্তানের মা এক নষ্টচরিত্রা নটী যে কিছুদিন আগে 'উত্তরায়ণ' ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।'

—'কি বলছেন আপনি ?'

—'আমি যা বলছি এবং বলব তার প্রতিটি শব্দ সত্যি। সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না। শপথ করছি আপনার সামনে। আপনি এবার বিচার করুন—বলুন, মামার বিষয় থেকে যে আমাকে এ ভাবে বঞ্চিত করল তাকে সরিয়ে ফেলে আমার প্রাপ্য বিষয় ফিরে পাবার চেষ্টা করা আমার পক্ষে অন্যায় কি না।'

—'আপনি তাকে মেরে ফেলতে চান নাকি ?' শান্তা আঁতকে উঠল।

—'যে আমার সর্বনাশের মূল তাকে যদি উচ্ছেদই করি ? দোষ কী ? তার ওপর আমার তো কোন মায়া নেই। ধরুন আপনাকেই যদি বলি যে আমার মামার সেই অবৈধ সন্তান, কাজরীর ছেলে, এতক্ষণ আপনার কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিল, আপনি কি আবার তাকে

স্নেহের সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরবেন, না রাস্তায় ফেলে চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন ?'

শান্তার শরীর কেঁপে উঠল। গাড়ির ভেতর আড়চোখে সে চেয়ে দেখল খুশী অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

দুলাল শান্তার মনের ভাব বুঝতে পারল। হেসে বলল, 'তাহলে বুঝে দেখুন আমার পক্ষে খুশীর সর্বনাশ করা কত স্বাভাবিক। তবে আমার কাঙালপনা শুধু বিষয়ের জন্যেই নয়। জগতে এমন জিনিস আছে যা পেলে আমি খুশীর চেয়েও নিজেকে ধনী বলে মনে করব।'

শান্তা ঘাবড়ে গেল। কঠিন হয়ে বলল, 'কী বলতে চান আপনি ?'

দুলাল আরও গম্ভীর হয়ে গেল। শান্তাকে আর 'আপনি' বলল না সে। জবাব দিল।—'আমি বলতে চাই, তুমি বিষ্ণুর আশা ছেড়ে দাও। যার জন্যে তুমি সমাজ, সম্মান, ভবিষ্যৎ সব ত্যাগ করে 'উত্তরায়ণ'-এ যোগ দিলে সে মানুষ নয়। সে আমার চেয়েও অধম, নীচ। নইলে, ভেবে দেখ, ষ্টেজে আগুন লাগার সময় সে তোমার বিপদের কথা ভুলে গিয়ে ছোটে কাজরীকে উদ্ধার করতে—আর একথা জানবার পর যে কাজরী এক অবৈধ সন্তানের মা ? সব জিনিসের একটা সীমা থাকা উচিত। তোমার সহ্যের সীমা আছে কিনা জানি না কিন্তু আমার আছে। তুমি ভালমানুষী করে নিজের সর্বনাশ এমন করে ডেকে আনলে আমি তা সহ্য করতে পারব না।'

দুলাল চুপ করল। শান্তা কোন কথা বলল না দেখে সে আবার বলতে লাগল—'হয়ত আমি তোমার যোগ্য নই। বিষ্ণুর মত আমি অত লেখাপড়া শিখিনি। লোকে আমায় মাতাল, দুশ্চরিত্র বলেই জানে। তার ওপর আজ আমার টাকার জোর নেই। তবু আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে রাজী আছি।—কী, তা তুমি জান। তোমার ভালবাসা। যতটুকুই তুমি দাওনা কেন আমি তাই পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করব। আর শপথ করব যে যদি কোনদিন তুমি আমায় বিয়ে কর তোমার যোগ্য স্বামী হবার জন্যে আমার চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না।' দুলাল নতজানু হলেও এর চেয়ে করুণ শোনাত না তার কথাগুলো।

শান্তা চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দুলাল শেষবারের মত বললে, 'য়া বলতে হয় এখনই বল। আর সময় নেই। একটু পরেই আমার লোকেরা কাজরী আর বিষ্ণুকে নিয়ে এখানে এসে পৌঁছবে। তোমায় আমি আটকে রাখব না। ইচ্ছে হয় বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট ভালবাসা পাবার লোভে তুমি ওর সঙ্গে ফিরে যেতে পার। কাজরী আর খুশীর ভার আমি নেব। আর যদি তোমার মধ্যে এতটুকু আত্মসম্মানবোধ থাকে তুমি খুশীকে কাজরীর হাতে তুলে দিয়ে আমার সঙ্গে ফিরে যেতে পার। তারপর 'উত্তরায়ণ'-এর সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে তুমি আর আমি অনেক দূরে চলে যাব—যেখানে লোভ নেই, হিংসে নেই, পাপ নেই। তুমি আমাকে নতুন করে গড়তে চাও, তোমার মনের মতন গড়তে চাও, আমি আপত্তি করব না। আমার সব ভাবনাচিন্তা তোমার হাতে তুলে দিয়ে নির্বোধ শিশুর মত আনন্দে দিন কাটাব। বল, রাজী আছ ?'

বলতে বলতে লেভেলক্রসিং-এর এর ওপাশে মোটরের আলো দেখা গেল। দুলাল চমকে উঠে বলল, 'ওরা এসে গেছে।'

বিষ্ণুর ট্যাক্সি বন্ধ গেটের ওপারে দাঁড়াল। দুলাল ব্যস্ত হয়ে যাচিয়ে নিতে গেল। গেট অবধি গিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কালু! সব ঠিক আছে ?'

কালু ট্যাক্সি থেকে নেমে এসে ওদিক থেকে জবাব দিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ট্রেন আসছে। ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

বিষ্ণু ইতিমধ্যে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছিল। সেও কথা বলবার জন্য এগিয়ে এল গেটের কাছে। দুলালকে জিজ্ঞেস করল, 'শান্তা আর খুশী কোথায় ?'

—'ভয় নেই। দুজনেই নিরাপদে আছে।'

—'এবার তুমি কী চাও, বল ?'

—'শান্তাকে জিজ্ঞেস কর।'

বিষ্ণু বুঝতে পারল না তুলালের হেঁয়ালী। তবে কি তুলালের এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে শান্তাও জড়িত ?

বিষ্ণু কী বলল শোনা গেল না। উজ্জল আলো মাথায় করে ট্রেন এসে পড়ল। বিরাট এক মালগাড়ি। সকলের মুখ একবার দেখে নিয়ে তু-পক্ষের মাঝখানে একটা চলন্ত প্রাচীরের সৃষ্টি করল।

ওদিকে পুলিসের জিপখানা দিদিমার কালো অস্টিন গাড়িকে ধরে ফেলল প্রায় মাঝামাঝি রাস্তায়। দিদিমার মুখে সব কথা শুনে পুলিস অফিসার বারবার দিদিমাকে প্রশংসা জানাতে লাগলেন তাঁর সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের। বললেন, 'আপনার মনের জোর দেখে নিয়তি যেন আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। নইলে এ ভাবে আপনাদের গাড়ি ধরতে পারতাম না। যাই হোক তাড়াতাড়ি আমরা রওনা হয়ে পড়ি—এই ক-মিনিটে গাড়ি তুটো আবার খানিকটা এগিয়ে গেল।'

দিদিমার গাড়িকে পেছনে রেখে পুলিস-জিপ ছুটল তুলালের গাড়ি আর ট্যাক্সির সন্ধানে। ড্রাইভার এ্যাকসিলারেটারের শেষ সীমায় পা রেখে অনেকক্ষণ গাড়ি চালাবার পরও আগের গাড়ি তুটোর কোন চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না। পুলিস অফিসার প্রায় হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। ভাবছিলেন তুলাল অন্য কোন রাস্তায় গাড়ি তুটো ঘুরিয়ে নিয়ে পালিয়েছে কি না। এমন সময় হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল সামনে মালগাড়ি। গেটের এপাশে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে জিপের আলো নিভিয়ে দেওয়া সত্বেও কালু আর বাঞ্ছারাম টের পেয়ে গেল যে তারা ধরা পড়ে গেছে। তুজনে পলকের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে কোথায় লুকিয়ে পড়ল বুঝতে পারা গেল না।

পুলিস অফিসার ও কর্মচারী রিভলবার হাতে নেমে এসে বিষ্ণুদের ট্যাক্সির পাশে এসে দাঁড়ালেন। বিষ্ণু থতমত খেয়ে গেল

তাঁদের দেখে। পুলিস অফিসার সংক্ষেপে কথা শেষ করে ড্রাইভারের আসন দখল করে বসলেন। গাড়ির চাবিটা লাগান আছে দেখে কর্মচারীকে বললেন পাশে বসতে। ড্রাইভার জিপ থেকে নেমে আসতে তাকে বললেন সে যেন দিদিমার গাড়ির সঙ্গে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এখানে—গেট খোলার পর তিনি নিজে ট্যাক্সি চালিয়ে যাবেন। দুলাল তাহলে সন্দেহ করবে না। তাকে চট করে ধরে ফেলা যাবে।

খানিক বাদে মালগাড়ি পার হয়ে যেতে লাইনের ওপারে দুলালের সাদা গাড়িটা দেখা গেল। পুলিস অফিসার সঙ্গে সঙ্গে হেড-লাইট জ্বাললেন যাতে জিপখানা দুলাল না দেখতে পায়। কিন্তু গেট খোলবার আগেই দেখা গেল দুলালের গাড়ি স্টার্ট দিয়ে শোঁ করে বেরিয়ে গেল।

পুলিস অফিসার বিষ্ণুকে বললেন, 'দেখেছেন কী চালাক! আপনাদের ট্যাক্সি-ড্রাইভার আর তার সঙ্গী মালগাড়ি যেতে না যেতে লাইন পার হয়ে প্রভুকে দুঃসংবাদটা পৌঁছে দিল, যাতে অন্ততঃ খানিকটা হ্যাণ্ডিক্যাপ পেয়ে আমরা পেছিয়ে পড়ি। যাক তার জন্যে ভাবনা নেই। বেশী দূর ওদের যেতে দেব না। তবে লাইন পেরবার সময় আপনারা মাথা নীচু করে রাখবেন। দু-একটা ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ে আমাদের যাত্রা পণ্ড করে দেবার চেষ্টা হতে পারে।'

পুলিস অফিসারের অনুমান মিথ্যে নয়। মালগাড়ির শেষ ওয়াগন চলে যেতেই কালু আর বাঞ্ছারাম লুকিয়ে লাইন পার হয়ে দুলালের কাছে পৌঁছে যায়। দুঃসংবাদ পেয়ে দুলাল পাগলের মত ক্ষেপে ওঠে। শান্তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে তাকে জোর করে গাড়ির মধ্যে তুলে দেয়। আর হরিসিংকে বলে শান্তার পাশে বসতে যাতে হঠাৎ সে কোন দুঃসাহসের কাজ না করে বসে। কালু আর বাঞ্ছারামকে দুলাল সঙ্গে নেয় নি। তারা চেষ্টা করবে গেটটা যতক্ষণ বন্ধ রাখতে পারে।

দুলালের গাড়ি ছেড়ে দেবার পর কালু আর বাঞ্ছারাম ছুটে গিয়ে পয়েণ্টসম্যানকে আটকাল। গেট খুলতে দিল না তাকে। ভয় দেখাল মারপিঠের। পয়েণ্টসম্যানের তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে নির্জন বাড়িতে সে রাতের পর রাত কাটিয়েছে। গেট খোলার জন্যে লণ্ঠন হাতে করে মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে—বর্ষায় ভিজতে ভিজতে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে। তাকে যে ভয় দেখাবে সে এখনও জন্মায়নি। সে হাঁক দিল গলা ছেড়ে। স্টেশন থেকে শুনতে পাওয়া যাবে তার গলা। এখনই লাঠিসোঁটা হাতে দশবার জন চলে আসবে তাকে বাঁচাতে। পয়েণ্টসম্যানের বীরত্বের কাছে কালু আর বাঞ্ছারামকে হার মানতেই হল। তারা ভয় পেয়ে অন্ধকার রাস্তা ধরে দৌড় দিল নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে।

পয়েণ্টসম্যানের চীৎকার শুনে পুলিস অফিসার আর কর্মচারী ছুটে গিয়েছিলেন। পয়েণ্টসম্যান হাঁপাতে হাঁপাতে বললে যে ডাকাতগুলো ভয় পেয়ে পালিয়েছে। লণ্ঠনটাই যা ভেঙ্গে দিয়ে গেছে—আর কোন ক্ষতি তারা করতে পারেনি।

পয়েণ্টসম্যান গেট খুলে দিল।

এখন আর লুকোচুরির কিছু নেই। পুলিস অফিসার জিপ-ড্রাইভারকে বললেন ট্যাক্সির পেছন পেছন আসতে। ইতিমধ্যে দিদিমার গাড়ি এসে পড়ল। তিনখানা গাড়িই তখন সারবন্দী হয়ে ছুটল দুলালের সাদা গাড়িকে ধরতে।

হরি সিং পাশে এসে বসায় শান্তা রাগে অপমানে কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠেছিল। খুশীকে সোজা করে বসিয়ে যতটা পারল তার গা ঘেঁষে বসল।

দুলালের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। সে উন্মাদের মত গাড়ির স্পীড বাড়িয়েই যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তার কাছে ধরা পড়া আর মরার মধ্যে কোন তফাত নেই।

দুলালকে অমনভাবে গাড়ি চালাতে দেখে শান্তা বেশীক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারল না। বলে উঠল, 'কী মতলব আপনার ?'

দুলাল অট্টহাসি হাসল। হাসতে গিয়ে ষ্টিয়ারিংটা ঘুরে যাওয়ায় গাড়িখানা আর একটু হলে রাস্তা ভুল করে মাঠে নেমে যেত। ক্যাঁ—চ করে একটা বিশ্রী আওয়াজ হল। দুলাল কোনমতে টাল সামলে গাড়ির চাকাগুলো সিধে করল। দরদর করে ঘেমে উঠল দুলাল। আবার বাড়িয়ে দিল গাড়ীর স্পীড। খানিকটা যাবার পর সামনে সোজা রাস্তা পেয়ে শান্তাকে বলল, 'এখনও বল কী চাও। আমায় নিয়ে বাঁচতে চাও, না আমায় নিয়ে মরতে চাও ? যদি বাঁচতে আপত্তি না থাকে তাহলে বল,—সময় আছে। ছেলেটাকে রাস্তায় ফেলে আমরা চলে যাব। ওরা এসে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। তোমার জন্যে কেউ ভাববেও না। আর যদি তাতে রাজী না থাক তাহলে—।'

শান্তার বুক কেঁপে উঠল। শুকনো গলায় বললে, 'তাহলে কী ? বড় জোর খুন করবেন, এই তো ?'

দুলাল আবার কদর্যভাবে হেসে বলল, 'তাহলে এই ছোঁড়াটাকে আগে স্বর্গে পাঠাব, তারপর তোমাতে আমাতে নরকে যাব।'

খুশী ঠিক দুলালের পেছনেই বসেছিল। তার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল অনেক আগেই, কিন্তু চোখ খুলতে সাহস হচ্ছিল না। তবু কান খাড়া করে শুনছিল দুলালবাবু আর চন্দনাদির কথা। দুলালের শেষ কথাগুলো শুনে সে কী বুঝল সেই জানে। তার মস্তিষ্কের শিরাগুলো যেন দপ দপ করে উঠল। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে সেই ভীতু, দুর্বল ছেলেটি বন্য পশুর মত দুলালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাতে তার গলা চেপে ধরল।

এ রকম আক্রমণের জন্যে দুলাল বা হরি সিং প্রস্তুত ছিল না। হরি সিং বুঝতে পেরে এক ঘুঁষিতে খুশীর মাথাটা থেঁতো করে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার আগেই দুলালের হাতের মুঠো আলগা হয়ে ষ্টিয়ারিংটা বেঁকে গেল। নিমেষের মধ্যে বাঁদিকের দুটো চাকা রাস্তার

নীচে নেমে যেতে গাড়িখানা ডিগবাজি খেয়ে উলটে পড়ল পাশের ধানজমিতে।

কয়েকমিনিট বাদেই আর তিনখানা গাড়ি এসে পড়ল। দুলালের গাড়ির ঐ অবস্থা দেখে দিদিমা আর কাজরী দুজনেরই জ্ঞান হারাবার উপক্রম হল। কে জানে শান্তা আর খুশীকে ফিরে পাওয়া যাবে কিনা! আকুলরোদনে দুজনেই ভেঙ্গে পড়তে বিষ্ণু সাহস দিয়ে বলল, 'আমরা এতজন রয়েছি, ওদের বাঁচাতে পারব না?'

পুলিসবাহিনী, মহীপাল ও বিষ্ণুর চেষ্টায় হরি সিং ছাড়া আর সকলকেই গাড়ির তলা থেকে জ্ঞানহীন অবস্থায় বার করা গেল। পুলিস অফিসার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার ও কর্মচারীকে পাঠিয়ে দিলেন লোকজন ডেকে আনতে, আর খোঁজ নিতে যে কাছাকাছি কোন ডাক্তার বা হাঁসপাতাল পাওয়া যাবে কিনা।

ইতিমধ্যে হরিসিংকে উদ্ধার করার চেষ্টা চলতে লাগল।

গাড়ি থেকে গদি নামিয়ে আহতদের রাস্তার ধারে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। কাজরী ও দিদিমা ধানজমি থেকে আঁচল ও আঁচলার সাহায্যে জল এনে এনে যোগাতে বিষ্ণু কাপড় ছিঁড়ে ক্ষতস্থান ধুইয়ে বেঁধে দিতে লাগল। সকলের চোখেমুখে প্রচুর জলের ছিটে দেওয়া সত্ত্বেও কারুর জ্ঞান হল না।

বিষ্ণু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আহতদের গাড়িতে করে কোন হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতে পুলিস অফিসার রাজী হলেন তাঁর জিপ ও ড্রাইভারকে ছেড়ে দিতে। হরিসিং-এর একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি নিজে ট্যাক্সি চালিয়ে ফিরে যাবেন।

সেই কথামত শান্তা ও খুশীকে দিদিমার গাড়িতে তুলে বিষ্ণু দুলালকে নিয়ে জিপে অপেক্ষা করছিল ড্রাইভারের জন্যে। এমন সময় ড্রাইভার ও পুলিস কর্মচারী কোথা থেকে তিনখানা স্ট্রেচার সমেত একদল লোক এনে হাজির করল। পুলিস অফিসার আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে যেতে, দলের মধ্যে একজনকে বলতে শোনা গেল, 'আমরা 'ঊষা-সংঘ'-এর সেবকবাহিনী।'

'উষা-সংঘ'-এর নাম শুনে বিষ্ণু আর কাজরী তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে এল। কাজরী কাকে চিনতে পেরে বললে, 'কে? নিতাই?'

নিতাই কাজরীকে দেখে নিঃসন্দেহ হতে পারছিল না। তার জানা ছিল না উষাদি বিবাহিতা, বিধবা হওয়া তো পরের কথা।

কাজরী বুঝতে পেরে বললে, 'চিনতে পারছ না বুঝি? আমি উষাদি। —ইনি বিষ্টুদা। —তোমাদের এখানে কোন ডাক্তার আছেন?'

নিতাই অপ্রতিভ হয়ে বললে, 'না, উষাদি। তবে কিছু ওষুধপত্তর সঙ্গে করে এনেছি। যদি জখম খুব সাংঘাতিক না হয়ে থাকে তবে আজ রাত্তিরের মত আমাদের ক্যাম্পেই সবাইকে রেখে দিতে পারেন।'

—'তাতো বুঝতে পারছিনা ভাই। যাই হোক তুমি তোমার ওষুধের বাক্স আর একটা লণ্ঠন নিয়ে আমাদের সঙ্গে এস।'

নিতাই আর কাজরী তুজনে মিলে সকলের ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে ভালকরে ব্যাণ্ডেজ করে দিল। নিতাই বললে, 'আমার তো মনে হচ্ছেনা ভয় পাবার মত কারুর কিছু হয়েছে—ফ্র্যাকচার একটু আধটু হয়ে থাকবেই। তা এক কাজ করা যেতে পারে—আমাদের ক্যাম্পেই আপাততঃ এঁদের রেখে পাটুলীগ্রাম থেকে বিমলদাকে ডেকে আনা যাক। তারপর তিনি যা বলেন সেই রকম ব্যবস্থা হতে পারে।'

বিমলদার নাম শুনে কাজরীর মনে অনেকটা ভরসা হল। বিমলদা 'উষা সংঘ'-এর এক রত্নবিশেষ। বিলেত থেকে এফ, আর, সি, এস ডিগ্রি নিয়ে এসে 'উষা সংঘ'-এর সেবক-সেবিকাদের ট্রেনিং দেবার জন্যে পাটুলিগ্রাম ক্যাম্পে রয়েছেন মাস ছয়েক ধরে।

কাজরী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল—'পাটুলীগ্রাম এখান থেকে কত দূর? সেখানে সবাইকে নিয়ে যাওয়া যায় না?'

—'হ্যাঁ—তাও যায়। পাটুলীগ্রাম হবে আপনার মাইল দশেক।'

পুলিস অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করে তখন এই ঠিক হল যে শান্তা আর খুশীকে নিয়ে যাওয়া হবে পাটুলীগ্রামে। তুলাল আর হরি সিং থাকবে

পুলিসের তত্ত্বাবধানে। যদি হরিসিংকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা সম্ভব হয় তাহলে পুলিসবাহিনী দুজনকে নিয়ে আজ রাত্রেই কলকাতায় ফিরে যাবে। নয়ত নিতাই আজ দুলালের দেখাশুনো করবে।

নিতাই রাজী হল।

দিদিমার গাড়ি আর পুলিস-জিপ পাটুলীগ্রামের দিকে রওনা হয়ে গেল।

আটাশ

উষাদি এসেছে শুনে পাটুলীগ্রাম ক্যাম্পে সাড়া পড়ে গেলেও সকলে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে গম্ভীর হয়ে গেল। উষাদির নতুন বেশ তারা আগে দেখেনি। কেউ তা নিয়ে কোন প্রশ্ন করল না।

বিমলদা এক মুহূর্ত নষ্ট না করে রোগীদুটিকে তাঁর মেটেঘরের হাঁসপাতালে নিয়ে গেলেন। ফুটন্ত গরম জলে ছুরি-কাঁচি শুদ্ধ করে কাটাকুটি করলেন, সেলাই করলেন, তারপর নতুন করে ওষুধ লাগিয়ে এক গাদা নরম তুলোর ওপর শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন জায়গায় জায়গায়। ইনজেকশানও দিয়ে দিলেন দুজনকে, যাতে রক্ত আর বিষের সঙ্গে মেলামেশা না হয়। প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আঘাত কারুরই সাংঘাতিক নয়—আশা করছি সকালের মধ্যে দুজনেরই জ্ঞান হবে। তবে সঙ্গে যখন গাড়ি আছে ব্যাণ্ডেল থেকে মেজর দত্তকে একবার ডেকে

এনে দেখালে ভাল হয়—যদি কোন অপারেশানের দরকার হয়। আর ফ্র্যাকচারের চিকিৎসাও তিনি করতে পারবেন।'

দিদিমার গাড়ি পাঠান গেল না। মহীপাল বললে তেল নেই। বিমলদা বললেন কাল সকালে গেলেও ক্ষতি নেই।

রাত থাকতে উঠে মহীপাল টাকা নিয়ে চলে গেল টিনে করে পেট্রল আনতে। ফিরে আসতে বিমলদা একটি ছেলেকে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন ব্যাণ্ডেলে, মেজর দত্তর নামে একটা চিঠি দিয়ে।

ভোরের দিকে শান্তার একবার জ্ঞান হয়েছিল। কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণায় বেচারী ছটফট করছে দেখে বিমলদা তাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিলেন। শান্তা ঘুমিয়ে পড়ল।

বেলা বারটা নাগাদ মেজর দত্ত এলেন। রোগীদের দেখে বললেন, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবে আমায় ডেকে এনে ভালই করেছেন। একটু-আধটু ছুরি চালাতে হবে।'

কাজরী আগে থাকতে গরম জলের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। আধঘণ্টার মধ্যে মেজর দত্ত বিমলদার সাহায্যে দুটো অপারেশান শেষ করে ফেললেন। ঊষাদির সুব্যবস্থা ও সেবক-সেবিকাদের তৎপরতা দেখে মেজর দত্ত ঊষাদি ও তাঁর সংঘ-এর ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন।

ফ্র্যাকচারের কথা জিজ্ঞেস করতে মেজর দত্ত বললেন, আগে ক্রেপব্যাণ্ডেজ দিয়ে দেখতে। যদি দরকার হয় রোগীদের জ্ঞান হবার পর একদিন ব্যাণ্ডেলে পাঠিয়ে দিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক্স-রে ও প্লাস্টারের ব্যবস্থা করে দেবেন।

কাজরী মেজর দত্তকে একবার করুণ ভাবে জিজ্ঞেস করল খুশীর কথা। তিনি হেসে বললেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ দিন যে তিনি প্রাণরক্ষা করেছেন। বাকীটুকু বিমলের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

বেলা পড়তে চলল দেখে কাজরী বিষ্ণুকে জোর করে পাঠাল স্নান সেরে খেয়ে নিতে। তারপর দিদিমাকেও পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

দিদিমা বললেন, 'আমার জন্যে ব্যস্ত হয়োনা দিদি। আমার উপোস-সওয়া শরীর—কোন কষ্টই গায়ে লাগে না। একটু বাদে চারটি চিঁড়ে খেয়ে নেব অখন। তুমি তার চেয়ে যাও—কাল রাত থেকে সমানে খাটছ—মুখে কিছু দিয়ে এস—লক্ষ্মীটি! আমি খুশীর কাছে রইলুম, তোমার কোন ভাবনা নেই।'

কাজরী ম্লান হাসি হেসে দিদিমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল। খুশীর জ্ঞান না হলে, তার মুখ থেকে 'মা' ডাক না শুনলে, সে দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটতে পারবে না, দিদিমাকে তা কেমন করে বোঝাবে?

যাই হোক, বেলা দুটোর সময় খুশীর জ্ঞান হল। বিমলদা খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। কাজরী খুশীর মাথার কাছে বসেছিল। বিমলদা বললেন, 'ঊষাদি, এবার তোমার মন ঠাণ্ডা হল তো? আমি এখন খুশীকে একটু ঘুম পাড়াব। তুমি যাও—চান করে খেয়েদেয়ে নাও। পার তো তুমিও একটু ঘুমিয়ে নিও।'

কাজরী চলে যেতে বিমলদা খুশীকে ওযুধ খাইয়ে তার কাছে বসে রইলেন।

সত্যি এতক্ষণে কাজরীর মন ঠাণ্ডা হল। মুখে তার হাসি ফুটল। পুকুরে চলে গেল স্নান করতে। স্নানে যে এত শান্তি কাজরী তা জানত না। পুকুরের কালো ভারি জল যেন বরফের মত ঠাণ্ডা। তার শরীর জুড়িয়ে গেল পুকুরের জলে গা ডুবিয়ে। ডোঙার মত আঁচলটা বারে বারে ফুলে উঠতে লাগল জলের ওপর। টান দিতে মুক্তোর মত বুদবুদ গুলো বেরিয়ে এসে খেলা করতে লাগল জলের সঙ্গে।

অনেকক্ষণ ধরে সেদিন স্নান করল কাজরী। স্নান সেরে, কাপড় ছেড়ে, ভিজে কাপড় গামছা নিংড়ে, গোছ করে, চণ্ডীতলায় গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ কাঁদল আপন মনে, তারপর ঠাকুরকে প্রণাম করে ধন্যবাদ জানাল তার খুশীকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে।

দু-চারদিনের মধ্যেই বিপদ কেটে গেল। বিমলদা বললেন, 'ফ্র্যাকচার না হলেও দুজনেরই ডিসলোকেশান হয়েছে কয়েক জায়গায়। আমি ভাবছি প্লাস্টারটা ব্যাণ্ডেলে হবে না কলকাতায়।' দিদিমা বললেন, 'ব্যাণ্ডেলেই হোক। শান্তা একেবারে সেরে না ওঠা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না।'

দিদিমার এত ভাল লেগেছিল জায়গাটা যে কলকাতায় ফেরবার নামই করতে চাইছিলেন না তিনি। তকতকে ঝকঝকে ক্যাম্পের পর্ণকুটির—মাটি, বাঁশ আর গোলপাতায় তৈরী। স্নিগ্ধ শ্যামল গ্রাম—পটের ছবির মত। নরম মাটিতে পা ডুবে যায়, কিন্তু কাদা লাগেনা পায়ে। পুকুর ঘাট যেন কতকালের সই। পেলে আর ছাড়তে চায় না। গাছপালার দিকে চেয়ে চেয়ে আশ মেটেনা। এরা বাঁচতে জানে। জানা অজানা নেই—আদর কাড়াতে জানে। কত বিচিত্র পাতা, বিচিত্র ফুল, বিচিত্র প্রজাপতি, বিচিত্র পাখি। রূপের সীমা নেই। কিন্তু নাম নিয়ে কেউ ধুয়ে খায়না। এদের ছেড়ে যাব বললেই যাওয়া যায় না।

জ্ঞান হবার পর বিমলদা তাঁর হাঁসপাতাল থেকে শান্তা আর খুশী দুজনকেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। শান্তা চলে গেল দিদিমার ঘরে, খুশী কাজরীর ঘরে। তবে বিছানা ছেড়ে ওঠবার অনুমতি কেউ পায়নি।

কথা ছিল ব্যাণ্ডেল থেকে প্লাস্টার লাগিয়ে আসবার পর বিমলদা দুজনকেই ঘর থেকে বেরবার হুকুম দেবেন। কিন্তু ব্যাণ্ডেল থেকে ফিরে শান্তার জ্বর এল। বিমলদা খুশীকে চলতে ফিরতে দিলেন দু-একদিন বাদে—সকালে খুশীর ঘরে গিয়ে বললেন, 'আজ তোমার একঘণ্টার ছুটি। যাও একটু বাইরে ঘুরে এস।'

খুশীকে তখন পায় কে! সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে আগেই চলে গেল শান্তার কাছে। 'চন্দনাদি' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল শান্তার বুকের ওপর। চন্দনাদি উঠে বেড়াবার অনুমতি পায়নি বলে খুশীর করুণা হল। জিজ্ঞেস করল—'তুমি কবে ভাল হয়ে যাবে?'

শান্তা হেসে বললে, 'যেদিন বিমলদা তেতো ওষুধ দেওয়া বন্ধ করবেন।'

খুশী চন্দনাদির কথার মধ্যে অবিশ্বাস করার মত কিছু খুঁজে পেলনা। বললে, 'আমি বলব বিমলদাকে তোমায় ভাল ওষুধ দিতে?'

শান্তা হেসে আদর করল খুশীকে।—'তাই বোলো।'

খুশীকে ঘরে বা দাওয়ায় দেখতে না পেয়ে কাজরী পাগলের মত ছোটাছুটি করছিল। হঠাৎ শান্তার ঘরে খুশীকে বসে থাকতে দেখে হাসিকান্না মিশিয়ে কপট তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলে উঠল—'তুমি এখানে? আর আমি তোমায় সারা পৃথিবী খুঁজে বেড়াচ্ছি!'

খুশী অপরাধীর মত মাথা নীচু করে শান্তার কাছে সরে দাঁড়াতে কাজরী মনে মনে হেসে বলল, 'ঐ চেয়ারটাতে চুপটি করে বসে থাক—ওঁকে বিরক্ত কোরোনা।' তারপরে শান্তার দিকে চেয়ে বলল, 'এত দুরন্ত ছেলে।'

শান্তা এক হাতের ওপর মাথা রেখে পাশ ফিরে বললে, 'দুরন্ত হতে যাবে কেন? বলুন, বীরপুরুষ! বীরপুরুষ না হলে কি ও আমায় বাঁচাতে পারত?'

কাজরী পুত্রগর্বে পুলকিত হয়ে খুশীর দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

শান্তা খুশীর দিকে চেয়েছিল। খুশী তখন একটা খালি ওষুধের বাক্সকে রেলগাড়িতে পরিণত করতে ব্যস্ত। শান্তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল জলাপুকুর লেভেলক্রসিং-এর কথা। দুলালবাবু বলেছিলেন বিষ্ণুর সঙ্গে কাজরীও আসবে। তবে কাজরী কোথায় গেল? সে কি আসেনি বিষ্ণুর সঙ্গে?

কাজরীকে সে দু-দিন দেখেছিল 'উত্তরায়ণ'-এ, তাও দূর থেকে তার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন কখনও হয়নি।

পাটুলীগ্রামে জ্ঞান হবার পর থেকে সে ঊষাদিকেই দেখছে। অবাক লেগেছে তার ঊষাদিকে। দিদিমাকে একদিন না বলে পারেনি, 'ঊষাদি এত ভাল বলেই কি সকলকে এত ভাল লাগে—সবাইকে এত আপনার বলে মনে হয়? ঊষাদি কি মন্তর জানে?'

দিদিমা শুধু হেসেছিলেন।

খুশীর প্রতি ঊষাদির স্নেহ শান্তার মনে খানিকটা সন্দেহ জাগালেও সে সন্দেহ স্থায়ী হয়নি। ঊষাদি তো সকলকে স্নেহ করে। শান্তা দিদিমার ঘরে থাকলেও তাকে শোয়ান, বসান, ওষুধ খাওয়ান, সবই তো ঊষাদি করে।

মোট কথা ঊষাদিই যে কাজরী হতে পারে এ সম্ভাবনাকে শান্তা একেবারেই আমল দেয়নি। সে শুয়ে শুয়ে 'উত্তরায়ণ'-এর কাজরীর কথা ভাবছিল।

এমন সময়ে সংঘের একজন সেবিকা খুশীকে ডাকতে এল। বললে, 'চল তোমার খাবার সময় হয়েছে। মা ডাকছেন।'

শান্তা চমকে উঠল। খুশীর মা কাজরী তাহলে এইখানেই আছে? কী স্পর্ধা তার! বিষ্ণুর ওপরই শান্তার অশ্রদ্ধা জাগল। তবে কি কাজরীর জন্যে আর খুশীর জন্যে বিষ্ণু এখানে রয়েছে?—তার জন্যে নয়?

হঠাৎ শান্তার মাথা গরম হয়ে উঠল। তার ইচ্ছে হল কাজরীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে কুৎসিত ব্যাপারটার আজকেই একটা হেস্তনেস্ত করে। দরকার হলে ঊষাদিকে ডেকে সে এর মিমাংসা করে নেবে। চেঁচামেচি করবে, লোকজানাজানি করবে—সেই সঙ্গে বিষ্ণুরও মাথা নোয়াবে। কিন্তু বিষ্ণুকে সে বলতে বাধ্য করাবে যে সে কাকে চায়—কাজরীকে না শান্তাকে?

খুশী চলে যাচ্ছিল। শান্তা ডাকল।—'শোনো। তোমার খাওয়া হয়ে গেলে মাকে একবার বলবে আমার ঘরে আসতে?'

—'বলব।' বলে খুশী ঘাড় নেড়ে সংঘের মেয়েটির হাত ধরে চলে গেল।

খুশী চলে যেতে শান্তা আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। কাজরীর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়াটা একটা বড় কথা নয়। তবু শান্তা ভুলতে পারছিল না যে কাজরী তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কাজরীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের মধ্যেও যেন একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে! শান্তা ঘাড় তুলে খুঁজতে লাগল প্রসাধনের দ্রব্যগুলো। দুলালের গাড়ির তলা থেকে তার হাতব্যাগটা কেউ উদ্ধার করেনি। দিদিমা তাই মহীপালকে দিয়ে আনিয়ে দিয়েছিলেন স্নো, পাউডার, চিরুনি-টিরুনি।—শান্তা সেগুলো খুঁজছিল। জানলার ধারে দেখতে পেয়ে অতি কষ্টে হাত বাড়িয়ে তুলে আনল জিনিসগুলো—চটপট চিরুনি দিয়ে চুলের সামনেটা আঁচড়াল, এক আঙুলে খানিকটা ক্রিম তুলে মুখে ঘষল, পাউডারের ছোপও লাগাল এ গালে ও গালে, ছোট একটা আয়না সামনে ধরে দেখল তার রুগ্ন মুখের শ্রীবৃদ্ধি -হয়েছে কিনা। তারপর ক্লান্ত হয়ে বালিশের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিল।

এবার মনে হল নিজের বোকামির কথা। কী দরকার ছিল এই রণসজ্জার? সেধে শাস্তি নেওয়া হল এক রকম। তাছাড়া গায়ে পড়ে কাজরীর সঙ্গে আলাপ করে কী লাভ হবে তার? আর হটাতে চাই বললেই কি সে কাজরীকে হটিয়ে দিতে পারবে? 'উত্তরায়ণ'-এ কাজরীর স্থান সে দখল করেছে—তার প্রতিশোধ কাজরী কি নেবে না? এখন তো তারই ছেলে 'উত্তরায়ণ'-এর মালিক। তার তূণে অস্ত্রের আর অভাব কই? বিনিময় করবার, দাবি করবার, অধিকার তো সম্পূর্ণ কাজরীর। শান্তার কী আছে যে সে কাজরীকে বলবে বিনিময়ে বিষ্ণুকে দাও। কার্তিকবাবু বেঁচে থাকলে হয়ত বা বলা চলত, তুমি 'উত্তরায়ণ'-এ ফিরে যাও, আমায় বিষ্ণুকে ফিরিয়ে দাও। এখন আর বলা চলে না।

শান্তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে চোখ চেয়েও এত অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল যে টের পায়নি কখন ঊষাদি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—'আমায় ডেকেছেন ?'

শান্তা চমকে উঠে ঊষাদির মুখের দিকে তাকাল।—'আপনাকে ?'

—'খুশী বললে।'

—'খুশী ? না—না, খুশী বোধ হয় ভুল করেছে।'

শান্তা ভীষণ বিব্রত বোধ করতে লাগল।

কাজরী শান্তার মাথার কাছে সরে গিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'খুশী ভুল করেনি। আমার নামই কাজরী।' শান্তার মুখ লজ্জায় করুণ হয়ে গেল। অসম্ভব বলে যাকে বাতিল করে দিয়েছিল তা যে চরম সত্য হয়ে এ ভাবে লজ্জা দেবে সে কী করে জানবে ? এবার আর না মেনে উপায় নেই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার হার হয়েছে। কৃত্রিম হাসি হেসে শান্তা কাজরীর দিকে তাকাল। বললে, 'তা আমি জানি। আমি ঠাট্টা করছিলুম।'

এমন সময় দিদিমা পান খেতে খেতে ঘরে ঢুকলেন। কাজরীকে শান্তার বালিশ ঘেঁষে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'দুই বোনে কী পরামর্শ হচ্ছে ?'

শান্তা ধরা দিল না। কাজরীই ঊষাদি তা সে অনেকদিন ধরে জানে এই মিথ্যে ভানকে সত্যির মত করে বলল, 'আমি বলছিলুম যে ঊষাদি এখানে পড়ে থাকলে খুশীকেই বা কে মানুষ করবে আর 'উত্তরায়ণ'-ই বা কে চালাবে ?'

ঠিক সেই সময়ে বিষ্ণু ঘরে ঢুকল। সকলে তার দিকে তাকালেও সে চাইল না কারুর দিকে। শান্তার বিছানার পাশে বেতের টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওষুধের শিশিগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। কোন কথা বলল না।

দিদিমা বিষ্ণুকে লক্ষ্য করে বললেন, 'শান্তা বলছে ঊষাদি এখানে থাকলে খুশীকেই বা মানুষ করবে কে, আর 'উত্তরায়ণ'-ই বা কে চালাবে ?'

বিষ্ণু গম্ভীর হয়ে বলল, 'যার ভাবনা সে ভাবুক।'

দিদিমা হেসে বললেন, 'কেন ভাই, তুমিও তো সেদিন আমায় এই কথাই বলছিলে দুঃখু করে।'

—'না-না। আমি দুঃখু করে বলব কেন? এতে আমার দুঃখু করার কী আছে?'

কাজরী অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ছুতো করে ঘর থেকে চলে গেল।—'শান্তাদির দুধ খাবার সময় হয়েছে—আমি যাই। উনুনটা আবার নিভে গেল কি না দেখি।'

পরদিন খুব সকালে নিজের আর খুশীর বিছানা তুলে, ঘর পরিষ্কার করে সামনের দাওয়া ঝেঁটিয়ে, কাজরী ময়লা জামাকাপড়গুলো জড় করছিল পুকুর ঘাটে নিয়ে যাবার জন্যে। এমন সময় বিষ্ণু এসে ঘরে ঢুকল।

কাজরী অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। আজ প্রথম বিষ্ণু এ ঘরের চৌকাঠ মাড়াল। কাজরীর বুঝতে দেরি হল না যে বিষ্ণুর দুশ্চিন্তা তাকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে তুলে দিয়েছে।

কদিন ধরেই বিষ্ণু ছটফট করছে তাকে কী একটা বলবার জন্যে। বিষ্ণু কী বলবে তাও কাজরী আন্দাজ করতে পেরেছে কাল দিদিমার কথা শুনে। বিষ্ণুকে তাই মনের কথা ভাঙবার সুযোগ দিয়ে সে নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

বিষ্ণু সোজাসুজি বলে ফেলতে পারল না তার জমান কথাগুলো। কাজরীর পিঠের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি কি কিছুতেই 'উত্তরায়ণ'-এ ফিরে যেতে পার না?'

—'না।' কাজরী বসে বসেই জবাব দিল।

—'কেন? 'উত্তরায়ণ' এখন খুশীর। তাকে উচ্চআদর্শে গড়ে তোলার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তোমার—দায়িত্বের কথা বাদই দিলাম। একবার কি ইচ্ছেও করছে না খুশীর 'উত্তরায়ণ'-কে নতুন করে সাজাতে?—অভিনয় না হয় না-ই করলে!'

—'ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। আমার জন্যে যে পথ তুমি বেছে দিয়েছ তা এখনও ফুরোয়নি—কোনদিন ফুরোবে না। আর, এ পথে যাত্রা করার আগে তোমার কাছে শপথ করেছিলাম যে বাধা পেয়ে কোনদিন ফিরে আসব না। এখন তুমিই আবার বাধা দিচ্ছ কেন? আমায় পরীক্ষা করছ?'

—'না। আমি যা বলছি মন থেকেই বলছি।'

—'কিন্তু আমি যা করছি তাও তো তোমারই বলে দেওয়া কর্তব্য। এ আদর্শ পালন করার আদেশ কি মন থেকে দাওনি?'

—'তাবলে তোমার নিজের কোন আদর্শ থাকবে না, জীবনে কোন লক্ষ্য থাকবে না, এ কথা তো আমি বলিনি।'

—'আমার জীবনের লক্ষ্য তুমিই স্থির করে দিয়েছ। আমার নতুন নাম, নতুন জীবন তুমিই দান করেছ। আমি তোমার আদর্শকে নিজের আদর্শ বলে মেনে নিয়েছি। নিজেকে ধন্য মনে করেছি। আর তো আমি কিছু চাইনি!' বলে কাজরী মাথা নীচু করল।

বিষ্ণুর মুখ দিয়ে কথা বেরল না। কিছুক্ষণ পরে কাজরী আবার বলতে লাগল।—'মনে কোরনা 'ঊষা সংঘ'-এর পরিচালিকা হয়ে প্রশংসা বা খ্যাতির ওপর আমার লোভ জন্মেছে। সবাই জানে এ প্রশংসা বা খ্যাতি কার প্রাপ্য। তাছাড়া তুমি আমায় 'ঊষা সংঘ'-এর পরিচারিকা করে রাখলেও আমার জীবন এতখানিই সার্থক হোত।'

—'যদি সত্যিই মনে করে থাক যে তোমার জীবন একদিক দিয়ে সার্থক হয়েছে, তবে আর পাঁচজনকে এই সার্থক জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তুমি তো অন্যদিকেও নিজের জীবন সার্থক করতে পার।'

কাজরীকে এবার কথা ঘুরিয়ে নিতে হল। বললে, 'তুমি যদি ছোটছেলের মত আমায় অনবরত জেরা করতে থাক তাহলে আমি নিরুপায়।'

বিষ্ণু ছাড়লনা। বললে, 'কিন্তু তুমি আমার সরল প্রশ্নটাকে এড়িয়েই বা যাচ্ছ কেন?'

কাজরী উঠে দাঁড়াল। বিষ্ণুর দিকে ফিরে বললে, 'তুমি শুধু আমার কথাই ভাবছ, আর একজনের কথা একবারও ভেবে দেখছ না।'

—'কার কথা ?' বিষ্ণু দোষীর মত জিজ্ঞেস করল।

—'খুশীর কথা। আমি চাই সে মানুষের মত মানুষ হোক। আমার পরিচয় বা তার বাবার পরিচয়ে যদি সাধারণ সমাজে তার স্থান না হয় এই ভয়ে তাকে এতদিন ভগবানের ছেলে সাজিয়ে রেখেছিলুম।'

—'এখন তো আর পারবে না খুশীর পরিচয় লুকিয়ে রাখতে—তবে তোমার 'উত্তরায়ণ'-এ ফিরে যেতে আপত্তি কী ? আর 'উত্তরায়ণ'-এর বাইরেই বা কোথায় রাখবে খুশীকে ?'

—'আমার কাছে। আমার বিশ্বাস খুশী এই সংঘে থেকে নিজের পরিচয়ে তার নিজের স্থান অধিকার করে নিতে পারবে।'

—'তার মানে ?' বিষ্ণু আপত্তি জানা[illegible]। —'অমন একটা তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতিভাবান ছেলের ভবিষ্যৎ তুমি নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে বলি দিতে চাও নাকি ?'

—'না হয় দিলামই। ভাল কাজে ভবিষ্যৎ কেন প্রাণ বলি দেওয়াটাও তো নতুন কিছু নয় !'

—'কিন্তু ভুলে যাচ্ছ যে খুশীর মেধা, প্রতিভা এইসব ছেড়ে দিলেও, ভগবান তাকে অভিনয় করার যে অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন তা তিনি বারবার যাকে তাকে দান করবেন না।'

কাজরীর পছন্দ হলনা বিষ্ণুর এই যুক্তি। খুশীর অভিনয় করার ক্ষমতাটাকেই বড় করে দেখল বিষ্ণু ? বললে, 'যে ক্ষমতাকে তুমি অলঙ্কার বলে মনে করছ আমার কাছে তা কলঙ্কের শামিল।'

বিষ্ণু গুম হয়ে গেল কাজরীর কথা শুনে। একটু পরে বললে, 'তা যদি বল আমি মুখ বন্ধ করলাম। আমার কথা শুনে তোমার কলঙ্ক আর বাড়িও না।'

বিষ্ণু ঘর থেকে চলে গেল।

দু-দিন কাজরীর সঙ্গে বিষ্ণু ভাল করে কথা বলেনি। কাজরীকে তার জন্যে এতটুকু বিচলিত হতে দেখা গেল না। বোঝা গেল তার ব্রত ভঙ্গ হবার নয়। সে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে তার সকল দ্বন্দ্ব দূর হয়েছে—নতুন করে দ্বন্দ্ব জন্মায়নি। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে তাই নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

সেদিন শান্তা পথ্য করবে। সকাল থেকে কাজরীর বিরাম নেই। নিজে শান্তাকে স্পঞ্জ করিয়ে, তার মাথা ধুইয়ে, চুলের জল ঝরিয়ে, চুল আঁচড়িয়ে দিল। তারপর পরিষ্কার থালায় হলদে হয়ে যাওয়া মিহি চালের ঝরঝরে ভাত, সন্থ গাছ থেকে পেড়ে আনা সবুজ পাতিনেবু, নুন ও ঝোলের বাটি সাজিয়ে, শান্তার বিছানার সামনে বেতের টেবিলটা খালি করে তার ওপর রাখল। গেলাসে করে জল নিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। শান্তা এক কোষ জলে হাত ধুয়ে খেতে খেতে ভাবল এত যত্ন করে শত্রু যদি বিষও পরিবেশন করে তাও বোধ হয় অমৃত মনে করে পরম তৃপ্তিতে খাওয়া যায়।

কাজরী সামনে বসে খাওয়া দেখতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বললে, 'বিষ্ণুদার খুব ইচ্ছে 'উত্তরায়ণ'-কে মনের মত করে উচ্চআদর্শে গড়ে তোলেন। আপনি যদি বিষ্ণুদার সঙ্গে থেকে ও কাজটার ভার নেন, আমি তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে এ দিকটা সামলাতে পারি।'

—'তুমি আমার সঙ্গে কথা বোল না।' শান্তা থালাতে আঙুলগুলো ঠেকিয়ে রেখে বললে।

কাজরী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন? আমি কি কোন অন্যায় কথা বললুম?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী বললুম?'

—'আপনি।'

কাজরী হেসে উঠল।—'ও। ভুল হয়ে গিয়েছিল। সে যাক—'উত্তরায়ণ'-এর কথা যা বললুম তাতে তোমার মত আছে তো?'

শান্তার খাওয়া প্রায় হয়ে এসেছিল। এটা ওটা চিবোতে চিবোতে কথা বলতে লাগল।—'দেখ উষাদি, তোমার এত বুদ্ধি কিন্তু এটুকু কি তুমি বুঝতে পারনি যে থিয়েটার করতে আমার ভাল লাগেনা ?'

—'উত্তরায়ণ'-এর ভার হাতে নিলে তোমায় যে থিয়েটার করতেই হবে এমন কোন কথা নেই।'

—'না উষাদি। যে জন্যে আমি 'উত্তরায়ণ'-এ যোগ দিয়েছিলাম সে কাজ আমার মিটে গেছে। বাকী জীবনটা আমি চাই সাধারণ মেয়ের মত বাঁচতে, সংসার করতে, নাতি-নাতনী রেখে মরতে।'

—'কিন্তু 'উত্তরায়ণ'-এ বিষ্ণুদার কাজ যে এখনও মেটেনি। তার কি হবে ? তিনি রেগে গেছেন আমার ওপর, আমি 'উষা সংঘ' ছেড়ে 'উত্তরায়ণ'-এ ফিরে যেতে রাজী হইনি বলে। কিন্তু তিনি মনে মনে জানেন যে সংঘের কাজ করে আমি তাঁরই একটা আকাঙ্ক্ষা মেটাচ্ছি। তুমি যদি 'উত্তরায়ণ'-এর দিকটা দেখতে, তাঁর আর একটা আকাঙ্ক্ষাও তাহলে মিটত। আমার আর কোন ভাবনা থাকত না।'

শান্তা এবার খাট থেকে নেমে পড়ল। ডান হাতটা মুঠো করে আঁচাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল কাজরীর দিকে। বললে, 'আমি তা পারব না ভাই। 'উত্তরায়ণ'-এর উন্নতি করতে হয় উনি একলা করুন। এত জায়গা থাকতে নরকে ঢুকে পুণ্যসঞ্চয় করবার লোভ আমার অন্ততঃ নেই।'

শান্তা দরজার দিকে পিঠ করে কাজরীকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। দুজনেই জানতে পারেনি যে বিষ্ণু এসেছে, শান্তার শেষের কথাগুলো সব শুনেছে। বিষ্ণুর গলা পেয়ে তারা চমকে উঠে তাকাল তার দিকে।

—'বেশ।' বিষ্ণু গম্ভীর হয়ে শান্তাকে বললে, 'তাহলে 'উত্তরায়ণ' উঠে যাক। নয়ত অন্য কেউ সেখানে ভূতের নৃত্য শুরু করার ব্যবস্থা করুক। আমি মাষ্টারি করি, তুমি বাড়িতে সেলাইয়ের কারখানা খোল, আর উষা গ্রামে গ্রামে মাতৃস্নেহ বিলিয়ে বেড়াক।'

দিদিমা পূজোয় বসেছিলেন। শান্তা আজ পথ্যি করবে। তার খাওয়া দেখবার জন্যে ভাল করে পূজোও হয়নি। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দেরিই হয়ে গিয়েছিল বরঞ্চ। তিনি হন্তদন্ত হয়ে আসছিলেন। ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে বিষ্ণুর কথাগুলো শুনতে পেলেন।

দিদিমাকে দেখে বিষ্ণু পথ ছেড়ে দাঁড়াল। শান্তা সেই অবসরে বাইরে চলে গেল আঁচিয়ে আসতে।

কাজরী শান্তার এঁটো থালা-গেলাস তুলে নিয়ে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল। দিদিমা বললেন, 'ওগুলো রেখে একবার এস তো ভাই!—কথা আছে।'

দিদিমা বিষ্ণুকে প্রসাদ দিয়ে জানলার পাশে বসে পড়লেন। শান্তা আর কাজরী ফিরে আসতে তাদেরও হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করলেন। শান্তা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। কাজরী তার পায়ের কাছে নামমাত্র বসল। বিষ্ণু দাঁড়িয়ে রইল।

দিদিমা সকলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোদের কী এত ঝগড়া হচ্ছিল শুনি?'

কাজরী হেসে বললে, 'দেখুন না দিদিমা, বিষ্ণুদা খালি আমায় ছেলের খোঁটা দিচ্ছে।'

দিদিমা মমতাভরা কণ্ঠে বললেন, 'তোরা যদি আমার কথা শুনিস তো আমি তোদের একটা ভাল পরামর্শ দিই—শোন। উত্তরায়ণ-টুত্তরায়ণ ওসব কিছু নয়। আসলে বিষ্টুর মন কেমন করছে উষাদি আর খুশীকে ছেড়ে যেতে। কাজেই—।' বলে দিদিমা কাজরীর দিকে ফিরে বললেন, 'দিদিভাই, তোমাকে একটা মাঝামাঝি রফা করতে হবে।'

কাজরী দিদিমার চোখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল। দিদিমা বললেন, 'তুমি তোমার ছেলেটিকে বিষ্টু আর শান্তার হাতে তুলে দাও। ওরা খুশীকে মানুষ করুক।'

কাজরীর চোখ নিমেষের মধ্যে জলে ভরে উঠল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে, 'সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।'

দিদিমা আবার বুঝিয়ে বললেন, 'তোমার কোন ভয় নেই দিদি! খুশী তার বিষ্টুদার কাছে আনন্দেই থাকবে। কত লেখাপড়া শিখবে, কত পাশ করবে। আর তোমার মন কেমন করলেই তুমি টুক করে ছেলের কাছে চলে যাবে, নয়ত হুকুম করবে আমার ছেলেকে নিয়ে এস।'

বিষ্ণু গম্ভীর হয়ে থাকলেও বোঝা গেল যে দিদিমার প্রস্তাবটা সে তার দ্বন্দ্বের মাঝামাঝি মিমাংসা বলে মেনে নিতে রাজী হয়েছে। বললে, 'আমার মন কেমন করার কথাটা দিদিমা বাড়িয়ে বললেও এ কথা সত্যি যে আমার কাছে থাকলে খুশী একটা ছেলের মত ছেলে তৈরী হবে। তবে আমি ওর ভার নিতে পারি এক শর্তে, যে আমার যেমন খুশি তেমন ভাবে আমি ওকে মানুষ করব। ঊষা আমার ওপর কোনদিন মা-গিরি ফলাতে পারবে না।'

কথা ঐখানেই পাকা হয়ে গেল। শান্তা একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই দিদিমা দিন দেখে শান্তা, বিষ্ণু আর খুশীকে নিয়ে কলকাতায় যাবার জন্যে তৈরী হলেন।

ক্যাম্পের সকলে মালতীলতায় ঢাকা বাঁশের গেটের সামনে ভিড় করে বিদায় জানাবার জন্যে জড় হল। কেউ কলাপাতায় মুড়ে পান এনে দিল দিদিমাকে, কেউ দিল শান্তাকে খোঁপায় জড়াবার একগাছি মালা। খুশীকে কেউ কুল, কেউ পেয়ারা, কেউ তালপাতার টুপি উপহার দিল।

তার বরাতে কিছু জুটল না দেখে বিষ্ণু শেষকালে আর না বলে থাকতে পারল না—'বা-রে, আমায় তোমরা কেউ কিছু দিলে না?'

কে একজন বলে উঠল, 'ঊষাদি আপনার জন্যে চন্দন নিয়ে আসছেন।'

—'এত জিনিস থাকতে চন্দন?'

সত্যিই এত জিনিস থাকতে কাজরী একটা ছোট বাটিতে শ্বেতচন্দন এনে বিষ্ণুর কপালে তিলক এঁকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করল তাকে আর দিদিমাকে। তারপর খুশীকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তার মাথায় একটা চুমু খেয়ে, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল।

উনত্রিশ

কয়েকমাস পরে কাজরী একদিন দাওয়ায় বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সোজা হয়ে উঠল। চোখে যেন ঝাপসা দেখল। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—

শিশুরঙ্গ

ভূতপূর্ব 'উত্তরায়ণ'-এ শিশু নাট্যাগারের

শুভ উদ্বোধন

১লা বৈশাখ—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকা

'উষা'

(নাট্যকার—শ্রীঅদ্বৈত সান্যাল)

শ্রেষ্ঠাংশে—শ্রীমান খুশী সেন

অন্যান্য চরিত্রে –শ্রীমান ভন্টু দাস, শ্রীমান সঞ্জয় গুপ্ত,

কুমারী কনক বসু, কুমারী রাধা চক্রবর্তি

প্রভৃতি আরও অনেকে।

বিজ্ঞাপনটা যে কাজরী কতবার পড়ল তার ঠিক নেই। ছেলের নাম ছাপা অক্ষরে পড়বার মোহ কেটে যেতে কাগজখানা ভাঁজ করে রেখে দিল। কিছুক্ষণ পরেই আবার সে উঠে গেল। কাপড় কাটার বড় কাঁচি নিয়ে এসে বিজ্ঞাপনটা কাটতে লাগল।

বিজ্ঞাপনটা কেটে নেবার পর কাগজের পাতায় যে চতুষ্কোণ শূন্যতার সৃষ্টি হল তার দিকে চেয়ে কাজরী চুপচাপ বসে রইল। তার স্মৃতির মধ্যেও সে যেন একটা চৌকো ফাঁকা জায়গা দেখতে পাচ্ছে। চলচ্চিত্র শেষ হয়ে গেছে। এখন আর কার্তিকবাবু নেই, 'উত্তরায়ণ' নেই, কাজরী নেই, অভিমন্যু নেই। সাদা পর্দাটা শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছে—তুমি যা দেখেছ তা কল্পনা, এখন তুমি যা তাই বাস্তব।

কাজরীর গলার ভেতর একটা শির টন টন করে হঠাৎ তার দু-চোখে জল উথলে উঠল। সে দৌড়ে ঘরের ভেতর চলে গেল। দেয়ালে টাঙ্গান আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে চমকে উঠল নিজের প্রতিবিম্ব দেখে। যাকে সে দেখতে পাচ্ছে সে উষাদি—সে বাস্তব, সত্য, জীবন্ত। যাকে সে দেখতে পাচ্ছে না সে কোথায়? সে কি কল্পনা, মিথ্যা, মৃতা?

কাজরী নিজেকে আর সামলাতে পারল না। তোলা বিছানার ওপর হামড়ে পড়ে ক্রমাগত কাঁদতে লাগল।